হেমন্ত’কে বলা এলোমেলো কথা

মা, পারো কি?

মা, গর্ভনিরোধক পিল ওই ব্রিজের ওপর থেকে

ছুড়ে ফেলে দাও নদীর সবচেয়ে গভীর খাদে—

রঙিন মাছেরা ওই পিল খেয়ে জন্মের তরে

বাঁজা হয়ে যাক। কালো পিচের মতো পানির ঢেউয়ে

কোনো দিন আর যেন জন্ম না নেয় তারা

প্রজাপতির মতো উড়িবার সাধ নিয়ে।

মা, পারো কি প্রসব করতে আবার আমাকে

অন্য কোনো পৃথিবীতে, অন্য সময়ের লাশ কাটা ঘরে?

পালক গজানোর আগেই আমার ঝরে গেছে ডানা—

আমার কঙ্কাল তুলোর মতন নরম এই

বাস্তবতার বিজ্ঞ বুলডোজারের কাছে।

একটা হাড়ও আর আস্ত নেই, চোখে ধুলার পরত

জমে যাচ্ছে—পলক ফেলতেই নড়ে ওঠে যেন

মরুভূমির ইঁদুর। এমন ধুলা ধোয়ার জন্য

নেই কোনো কান্নার ওয়াশিং মেশিন।

মা, আগত এ শীতে পাখিরা নিয়েছে চিনে

নিজের রক্তের তাপে ফ্রাই করা প্রিয়তম আত্মা।

দূর থেকে পাখিদের গান শুনে গাইতে গেলেই

আমার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে আসে লক্ষ লক্ষ গোলাপের কাঁটা।

হাইব্রিড গোলাপের কাছে গেলে বলে, সে নাকি তার

গন্ধ হারিয়ে ফেলেছে সিজনাল প্রেমের দোকানে।

সিজনাল সর্দি-কাশির জীবাণু লাগা রুমালে

কাফনের মতো নিজেকে মুড়ে

পালিয়ে গেছে শাশ্বত প্রেমের সুবাস।

প্রতিদিন একই হাটে নিজেকে বেচার দরদাম

করতে করতে দেখো দরদর করে ঘামছি, তবু নিজেকে

বেচে যাচ্ছি পাক্কা জুয়াড়ির চালে।

আমার বেড়ে ওঠা থেমে গেছে ঠিক যেন একটা প্লাস্টিকের গাছ।

অথচ তোমার গর্ভের আকাশি নার্সারিতে আমি

বেড়ে উঠছিলাম সূর্যের সমান এক আগুনের বেলুন হয়ে।

মা, পারো কি জন্মাতে খুঁজে খুঁজে কোনো

আদিম, আনকোরা গ্রহের জঙ্গলে? তারপর আমাকেও

টেনে বের করতে তোমার গুপ্ত, শীতল পেটের ভাঁজ খুলে?

মা, পারো কি লুকিয়ে রাখতে আমাকে এ অগ্নিবৃষ্টিতে

তোমার ছাতার আড়ালে? মা পারো কি, পারো কি আমাকে

আবার ফেরত নিতে তোমার স্মৃতিহীন কারাগারে?

সেক্স মেশিন

প্রেম তোমার হাত ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া

পুরনো প্রেমিকা—যে এখন বৃদ্ধাশ্রমে বসে বসে

উল দিয়ে হৃদয়ের হতাশা বুনছে।

আর তুমি উলভারিনের মতো বুড়ো বয়সের যুবক—

কচি কচি মেয়েদের মগজ ধোলাই করছ আর

পকেটে পুরে নিচ্ছ। প্রেম নিয়ে কবিগানের লড়াইয়ে

তোমার ওপরে তো কেউ নেই, অথচ তুমি

নিজের জন্য বরাদ্দ রেখেছ একটুকরো ঊষর ফুলবাগান।

ও কীর্তিমান সেক্স মেশিন! তুমি মহান—

তুমি ফ্লেক্সিবল জেলিফিশের মতো বদলাও নিজেকে

তুমি বুদ্ধিমান, তুমি পোস্টমডার্ন।

ও ও কীর্তিমান সেক্স মেশিন! তোমার চিরকুমার চিরকুমারীর

সভায় বেলুন হয়ে উড়ে যায় সমবেদনার চাঁদ—

মহাকালের অন্ধ গোরস্থানে তোমার ঝাপসা ধারণা নিয়ে

হাত ধরি তোমার মতো দেখতে তোমার রেপ্লিকার।

কীর্তিমান সেক্স মেশিন! তুমি অন্ধ-কালা-বোবা-হৃদয় প্রতিবন্ধী

তোমার নিরীহ, মাথামোটা ছাঁচে যা-ই দেওয়া হয়

তা-ই যেন হয়ে যায় অভিশপ্ত সোনার মোহর।

আর তোমার অদৃশ্য শীতল আগুনে পুড়ে যায়

রাজকুমারী থেকে ডাইনিবুড়ি সবাই।

পৃথিবীর চলতি বৈষম্যের ঢেউয়ে

তুমি একমাত্র অকুণ্ঠ সাম্যবাদ।

করোনা-প্লেগ-যুদ্ধ-মহামারির ছড়াছড়ির মধ্যে

তুমি অবিনশ্বর, আলোকিত শান্তির পতাকা।

হে কীর্তিমান সেক্স মেশিন! আমাকে করে নাও তোমার

হার্ডকোর ফ্যান—যাতে আমি পুড়িয়ে দিতে পারি

ট্রয়ের চেয়ে প্রাচীন, পূর্বপুরুষের বরফ জমা রক্তের গ্লানি।

হেমন্ত'কে বলা এলোমেলো কথা

হেমন্ত! তোমার সূর্যমুখী রোদ

মনে করায় অপমৃত্যু

এই পৃথিবীর কোথাও জানি তুমি আছ

কিন্তু রঙের বাক্সে অদৃশ্য!

বলার কিছুই নাই...

তাই আঙুল খুঁটে যাই...

ফিরে আসি নৈঃশব্দ্যে,

যেখান থেকে একদিন

শুরু হয়েছিল

শব্দদূষণ আর সংগীতের

পথ-পরিক্রমা।

এই নরকে যে প্রেম প্রচলিত আছে

আমার ভাগ্যেও জুটে যায় তা।

চারপাশে মিথুনরত প্রেমিক-প্রেমিকা

ওরা চায় লাইফ সাপোর্ট,

চায় দেয়ালে একটা করে জানালা,

একটা ছাদ আর কিছু পাখি

ঘুমিয়ে পড়লে সমুদ্র থেকে

এক হাওয়া এসে ওদের ঘুম-ঘুম

কোমল নিঃশ্বাস থেকে

চুরি করে শুষে নেয় বনের ছায়া।

বেজে ওঠে হাড়ের দোতারা

এটা যুদ্ধের মাঠ!

শত্রুপক্ষের তীব্র আলো

দেখে ফেলেছে তোমাকে

এখন আর পিছু হটা যাবে না

দ্বিধান্বিত হয়ো না

সময় নষ্ট কোরো না

শুধু শুধু আক্ষেপ কোরো না

জ্বলন্ত ধানখেত,

জ্বলন্ত স্টক মার্কেট,

স্টেইনলেস রোদে বিদ্যুৎ চমকায়

মৃত্যু ফলে আছে মনে-আঙিনায়।

তোমার কথাও আমায় ভাবিত করে।

সব প্রসঙ্গ অপ্রসঙ্গের চৌরাস্তায়

দেখি তোমার প্রতিবিম্বের হাসি

বিন্দু বিন্দু সুমন্দ বাতাসে

মেঘের ক্যারাভানে উড়ে যায়।

ক্লান্তি, তারপরও ক্লান্তি

তারপরও ক্লান্তি, আবারো ক্লান্তি

বলো, কোন অতলে পালাব?

অতলই পালিয়ে গেছে।

বলার কিছুই নাই

তাই আঙুল খুঁটে যাই

ব্র্যান্ডিং

নরকের অন্ধকার ক্লাসরুমে উল্টা হয়ে ঝুলছিলাম,

কে যেন আমার পাছায় গরম লোহার ছ্যাকা দিয়ে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে লাফ দিয়ে নামি ভূমিতে।

আমার পাশেই গাছ থেকে ঝরে পড়ল একটা বাদুড়ে খাওয়া

রসালো সফেদা। তার গায়েও ফল ব্যবসায়ীরা লাগিয়ে দিয়েছে

রংধনুর মতো ঝলমলে স্টিকার।

এটা ব্র্যান্ডিং-এর যুগ বেবি!

মুখ গোমড়া করে থাকলে হবে না।

চটপট পরে নিতে হবে ব্র্যান্ডের পোশাক পরিচয়।

শরতের সকাল বেলা লাল-নীল মেঘের ভেলা

মাথার ওপর। মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে

অনেক অনেক গার্মেন্টস মেয়ে খালি পায়ে

হেঁটে যাচ্ছে শহরের শূন্য দরজার দিকে।

সেই দরজা দিয়ে কি বাইরে তাকালে দেখা যায়

সরষে খেত, পেঁজা মেঘের নিচে ছোটো ছোটো বাড়ি?

সেইসব বাড়ি থেকে কিশোরী বের হয়ে

ওড়না উড়িয়ে ছুটে বেড়াত সরষে খেতে?

প্রেমিক সুঁইয়ের চুমুতে

তোমার কাটাছেঁড়া আঙ্গুলে বোনা কাপড় পরে

দেশে বিদেশে ক্যাটওয়াক করে ঝাঁকে ঝাঁকে মডেল।

আর বোকা মেয়ে তোমার গায়ে ব্র্যান্ডহীন ফ্যাকাশে পোশাক!

বটতলায় নরসুন্দরের দোকান পাখা মেলে

হয়ে যায় হেয়ারোবিকস। সবই ব্র্যান্ডের জোরে।

এটা ব্র্যান্ডিং-এর যুগ বেবি!

মুখ গোমড়া করে থাকলে হবে না।

চটপট পরে নিতে হবে ব্র্যান্ডের পোশাক পরিচয়।

বড়োরাস্তার মোড়ে যে শ্রমিকগুলো 'দিন আনি, দিন খাই'

এর ব্যাগার খাটতে বসে থাকে হাতুড়ি, ঝুড়ি, কোদাল নিয়ে

তাদেরকেও নেয়া হবে ব্র্যান্ড দেখে বাছাই করে?

একদিন আমাদের নদীগুলো, সমুদ্রগুলো

আইসক্রিমের মতো গলতে থাকা পাহাড়গুলো

পৃথিবীর সব মরুভূমি, দ্বীপ আর বনগুলো

ব্র্যান্ডের লোগোতে ঢাকা পড়ে যাবে?

আমাদের অভিমান, অভিযোগ, হাসি আর কান্নাগুলো

প্রতিবাদ, ঘৃণা, স্বপ্ন, বিভোরতাগুলো

পাগলামি আর ছাগলামিগুলো

ব্র্যান্ডেড হয়ে গেলে বাতিল হয়ে যাব আমরা নিজেরাই।

তখন আর তোমার সাথে প্রেম করব না প্রিয়!

ব্র্যান্ডের সাথে প্রেম করে ঠিক করব

আমাদের সন্তান হবে ঠিক কোন ব্র্যান্ডের।

আন্ডা

কক কক কক কক...

ডিম পাড় ডিম পাড় রে ময়না

তোর ডিম ছাড়া কর্পোরেটের সরাইখানা

একদিনও চলে না। মাথা ভর্তি

ডিম নিয়ে তুই সমুদ্রের মাছ

ডিম পেড়ে যাস ওই মরা নদীর

জ্যান্ত মোহনায়।

কক কক কক কক...

ডিম পাড়তে যেতেই হবে ময়না

তাই সকাল দশটায় বুদ্ধিনাশ

রাস্তায় নেমে সর্বনাশ!

সারাদিন ডিম পেড়ে পেড়ে রাত করে

চ্যানেলে ডিসটার্ব মার্কা ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ

শূন্যতা নিয়ে বাড়ি ফেরার সাধ।

প্রেমিকা রাগ করে চলে গেছে সন্ধ্যায়—

রিলেশন এখানেই বাদ।

কক কক কক কক...

কত কী করার ছিল ভাবিয়া কী করিতে আসিয়া

হইস না রে ময়না শকড। পড়িস নাই শিশুকালে

‘নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল

তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল’?

নিজেকে বড়ো করে না দেখে বরং দেখ

আর কত ব্যাগ রক্ত দিলে উর্বর হবে

ক্যাপিটালিস্টের রাক্ষুসে ফুলবাগান।

তোর মতন মহান মুরগি সম্প্রদায়ের

গোয়া দিয়ে লাল সুতা বের হোক

তবু ডিম পেড়ে যা নিঃশর্তে—

দুনিয়াদারি চলে রে ময়না

ওই ডিমের বেচাকেনার তত্ত্বে।

প্রতিবন্ধী

ওই যে তোমরা চিড়িয়াখানার গরাদের মতো ঘরের জানালায় ঝুলে ঝুলে ভাবছ, বাইরে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা কত স্বাধীন! তোমার আত্মজীবনীতে নিজেকে প্রতিস্থাপন করে টের পাই, আমিও অপার হয়ে বসে আছি মহাকাশ পাড়ি দিয়ে উড়ে আসা একটা হুইল চেয়ারের জন্য।

রাষ্ট্র এক মহান প্রতিবন্ধী গ্যাংস্টার, যে আমাদের দিয়েছে দুর্লভ প্রতিবন্ধীর মর্যাদা। সামনে-পিছনে-ডানে-বামে যারা আছে তারা সবাই বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী। তাই স্বস্তিতে চোখ বুজি। ওম শান্তি! আমি না হয় কালার ব্লাইন্ড কিন্তু আমার পাশের জন তো জন্মান্ধ!

ফেরার পথে ওভারব্রিজে তুমি উপুড় হয়ে আছ মাংসল একটা পোকার মতো। কেউ কেউ অপূর্ণ কামনার নাম করে, কেউ কেউ শুধুই করুণা করে দিয়ে যাচ্ছে দুই-পাঁচ টাকা। কেউ যেতে যেতে ভাবছে, তুমিও কী করে নাগরকে গরম করো আর প্রতিবছর জন্ম দাও একটা করে প্রতিবন্ধী সম্ভাবনা।

চিড়িয়াখানার গরাদের মতো ঘরের জানালায় ঝুলে ঝুলে তোমার কখনো আকাশ না দেখা চোখে একটু একটু করে জমছে নীলাকাশ। সেই আকাশে না জেনে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে দেখতে পাই, ক্রুশ থেকে নেমে মরা যিশু আমাদেরকে স্পর্শ করছে আর আমরা প্রতিবন্ধী থেকে হয়ে যাচ্ছি সুস্থ, স্বাধীন মানুষ। আহা!

ভাঙা পা, কাটা হাত, উপড়ানো চোখ, চুরি হয়ে যাওয়া মগজ নিয়ে তোমরা খেলো লন টেনিস, দাবা, হাডুডু, ব্যাডমিন্টন। হাত নেই বলে ছবি আঁকো মুখ দিয়ে। স্টিলের পা নিয়ে ট্র্যাকিং করো চাঁদের পাহাড়। কী বিস্ময়, কী বিস্ময়! দুর্নীতিতে ভালো রেজাল্ট করা দেশের জন্য নিয়ে আসো সোনা-রুপার মেডেল।

মিট দ্য প্রেসের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে এক প্রতিবন্ধী শিশুর গালে চুমু খেতে গিয়ে মনে পড়ে, তোমারও উড়াধুড়া যৌবনে একটা প্রতিবন্ধী শিশু জন্মেছিল—তুমি নিজেও জানোনি তার পিতা কে হতে পারে। সে এখন বড়ো হচ্ছে শহর থেকে অনেক দূরের একটা অখ্যাত অরফানেজে।

ওম শান্তি!

শান্তির খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে একদিন আমি

চলে আসলাম অশান্তিতে আপাদমস্তক নিমজ্জমান নরকে—

যেখানে এত্ত অশান্তি একসাথে হাতে হাতে

ধরি ধরি সহচরীর মতো নাচছে প্রলয় নাচ—

সেখানেই আত্মগোপন করে আছে শান্তি আমার বিশ্বাস।

শান্তির খোঁজ করছিল এক স্বেচ্ছাচারী প্রেসিডেন্ট—

তার জোড়া গোঁফের ছায়ায় আবছা রংধনু হয়ে

উড়ছিল শান্তির ডানা। কিন্তু সে কোনোদিনও শান্তির দেখা

না পেয়ে মরিয়া হয়ে শান্তির ফুল ফোটাতে চেয়েছিল

ড্রোন বোমার ধাতব অরণ্যে, কয়েক লক্ষ শিশুর নিঝুম কবরে।

শান্তি খুঁজছিল ফুটপাতে এক টোকাই বাচ্চা। শান্তি ছিল

তার মায়ের শরীরের গন্ধে। কিন্তু মা তাকে ছেড়ে নিরুদ্দেশ

হয়েছিল সাবেক প্রেমিকের হাত ধরে। তাই বাচ্চাটা

শান্তির গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে স্বপ্নের ভেতরে হেঁটে চলে গিয়েছিল

শিশু ইউটোপিয়ার পার্কে। সেখানকার বুড়ো ঈশ্বরের সাথে

তার বন্ধুতা হয়, সে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল

ঈশ্বরের কোলে। আসলে সে তখন ঘুমাচ্ছিল হাড্ডিসার

পথের কুকুরকে বালিশের মতন জড়িয়ে।

শান্তি চেয়েছিল এক আহত, স্তব্ধ প্রেমিক।

তার হৃৎপিণ্ড ফুটা হয়ে গিয়েছিল প্রেমিকার মিথ্যার

গুলিতে। শান্তি ছিল তার চোখের মণিতে দুইটা

অমর জোনাকি হয়ে। কিন্তু সে দুই হাত তুলে ‘শান্তি, শান্তি’

বলে চিৎকার করতে করতে ঝাঁপ দিয়েছিল রেলের কাটা স্লিপারে।

শান্তির জন্যে হন্যে হয়ে এক শরীর থেকে আরেক শরীরে

আছড়ে পড়ছিল এক অ্যামেচার গণিকা। শান্তি ছিল তার

ছেড়ে আসা গ্রামের নদীর ঢেউয়ের ভাঁজে লুকানো। কিন্তু সে শান্তির

শীতলপাটিতে বসে চুল আঁচড়াবে বলে উত্তপ্ত বাল্বের মতো

শরীরগুলোর স্পর্শে কাতর হয়ে নিজেই একদিন হয়ে গেল

অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির বিভীষিকা!

আজন্ম শান্তির কাঙাল ছিল এক ভবঘুরে রাখাল।

শান্তি ছিল তার বাড়ির পেছনে পরিত্যক্ত টমেটো খেতের নিচে।

কিন্তু সে শান্তির ফসল তুলবে বলে বারোমাস লাঙলের ফলায়

উৎপাদন করছিল অশান্তির ডাসা ডাসা বোম্বাই ঝাল।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জিতেছিল এক শান্তি শিকারি

আদিবাসী নেতা। অথচ শান্তি তখন একটা চড়ুই হয়ে

নোবেল কমিটির টেবিলের নিচে খুঁটে খাচ্ছিল উদ্বাস্তু অশ্রু।

নেতা শান্তিকে ধরে তার দেশে নিয়ে যাবে বলে

গভীর বনে ফাঁদ পেতে সেই ফাঁদে দাঁতাল শুয়োরের

মতো নিজেই খেয়েছিল ধরা।

শান্তির লোভে মাকড়সার মতো সংসারের জাল

বুনেছিল আমার মা। কিন্তু সংসার সব রকমের

সং দিয়ে তার মগজের অবস্থা জবরজং বানিয়ে

উপহার দিয়েছিল এক গোছা রঙিন শিকল। আর শান্তি

পঙ্গপাল মাকড়সার ছানা হয়ে খেয়ে ফেলেছিল শান্তির মা-কে।

শান্তির খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে একদিন আমি

চলে আসলাম অশান্তিতে আপাদমস্তক নিমজ্জমান নরকে—

যেখানে এত্ত অশান্তি একসাথে হাতে হাতে

ধরি ধরি সহচরীর মতো নাচছে প্রলয় নাচ—

সেখানেই আত্মগোপন করে আছে শান্তি আমার বিশ্বাস।

শীত

আমার রক্তের ঝরা পাতার বনে

আগুন জ্বেলে বসে আছি

মাকড়সার মতো বুনেছি রংধনুর জাল

যদি আসে কোনো সুদর্শন পতঙ্গ

আমারই মতো মরতে রাজি—

শিকার আর শিকারি পুড়ব পুরোনো আগুনে

আগুনের ছাই থেকে জন্ম নেবে

শিশির মাখা সকাল...

সখী! এক চালকবিহীন ট্রেনে চেপে

যাচ্ছে চলে শীত তোমার আঙিনার

সামনে দিয়ে, আমার বাড়ির পেছন দিয়ে।

সমুদ্রের তীরে একটা ফুটো অ্যাকোয়ারিয়াম থেকে

একটু একটু করে জল গিয়ে মিশছে সমুদ্রে।

তোমার সঙ্গে আমি সেই অ্যাকোয়ারিয়ামে কাটছি সাঁতার—

কিছুক্ষণ পরে পানি ছাড়াই ছটফট করে মারা যাব।

সখী! চালকবিহীন ট্রেনে চেপে চলে যাচ্ছে সময়...

এই শীতের চাদরের নিচে পাচার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বসন্ত!

জানি না এই শীতে হয়তো কাঁপছি শেষ কাঁপন

জানি না এই শীতে নিচ্ছি কুয়াশায় শেষ নিঃশ্বাস

জানি না এই শীতে পড়ছি শেষতম প্রেমে

এর পরের শীত আমার কাছে আগন্তুক, অচেনা...

মরা কুত্তার অণ্ডকোষে নাচছিল তৃষ্ণার্ত সরোবর

আমি সেই সরোবরের পাশে হাঁটু মুড়ে ডাকছিলাম

দূরের বৃষ্টিকে। সরোবরের শুকিয়ে যাওয়া ছিটেফোঁটা পানিতে

জ্বলছিল প্রজাপতি রঙের তারা।

সূর্যের রাগী রাগী দারোয়ানটা দিচ্ছিল

বৃষ্টির আসার পথে পাহারা। জীবন সেই পথের বাঁকে

বৃষ্টির দেখা না পেয়ে পান করছিল

মৃতপ্রায় কুকুরীর স্তন।

কাটা ঘুড়ির মতো পাহাড়ের উঁচু মাথায়

একে একে নেমে আসছে অতিথি পাখিরা।

ব্লেডের বদলে তাদের পালক দিয়ে সেবিকা কেটে নিচ্ছে

সদ্যজাত শিশুর নাড়ি। আমরাও অতিথি পাখির মতো

নেমে এসেছি দুর্দান্ত অন্ধকূপের জানালায়।

প্রতিটা রোমকূপ চায় তার জন্য বরাদ্দ

আলো-বাতাস-আগুন-জলের হিসাব।

মিটিয়ে সব পাওনা, দেনাগুলো করে দিয়ে যাব খারিজ।

শীতের চাদরের নিচে বসন্ত পাচার হয়ে যাচ্ছে

সখী, তুই কিন্তু মাথায় রাখিস!

মাছ

যদি হতাম মাছ, তাহলে কি আমিও মরার পরে আরো কিছুকাল কাটিয়ে দিতাম ডিপফ্রিজে সৎকারের অপেক্ষায়? তুমি মাছ খেতে পছন্দ করো না, মাংসতে আসক্ত। তবু তোমার মায়ের পীড়াপীড়িতে এক টুকরা মাছ উঠল পাতে। কিন্তু মাছের ফ্রাই করা চোখের দিকে তাকিয়ে তুমি কল্পনা করছিলে নীল সবুজ পানির আবরণে উপচে পড়া হ্যাপিনেসের মতো সূর্যের রশ্মির ভেতরে উড়তে উড়তে আসা মৎস্যকুমারীর অবাক মার্বেল চোখ। যে চোখের আয়নায় প্রায়ই তুমি নিজেকে দেখতে। সবসময় কাজল পরা যে চোখ দুইটাকে তোমার ইচ্ছা করত সারাক্ষণ আঁকতে। মাছটা পিরিচে তুলে তুমি ডাল দিয়েই ভাত খেয়ে ফেললে। আর আমি তোমার ভেতরে না যেতে পারার কষ্টে ফরমালিনের সব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সতীদাহে বালিকার দেহ উৎসর্গ করার ভঙ্গিতে পচিয়ে ফেললাম নিজের সর্বাঙ্গ, শুধু চোখ দুইটা বাকি রেখে।

প্লাস্টিক সুন্দরী

সুন্দরী, তুমি মেকাপের অতলে সমুদ্রের কান্না রঙের মুক্তা।

প্রসাধনীর চড়া পলিশ মুখে মেখে সাধনা করছ

সত্যের বিনয়হীন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে।

যেন প্রবালের শক্ত দেয়ালে পথ হারানো প্রজাপতি—

উড়তে চায় কিন্তু খুঁজে না পায় পালানোর বিরল ঠিকানা।

দাঁতাল হাঙ্গরের ধাওয়া খেয়ে এক ক্লান্ত নাবিক

চাঁদের আলেয়ার পিছে ছুটতে ছুটতে জাহাজ ভেড়ায়

কোনোদিনও ফুল না ফোটা বাগানের কঙ্কালে।

সভ্যতা তোমার হাতে এগিয়ে দেয় কড়া লাল লিপস্টিক।

যে লিপস্টিকের রং তোমার মৃত প্রেমিকদের তাজা রক্তের

পাইরেটেড কপি। সভ্যতা তোমার হাতে এগিয়ে দেয়

কুচকুচে লিকুইড কাজল। যে কাজলের কালো ঘনত্ব

আফ্রিকার গভীর অরণ্যের দীর্ঘশ্বাস চুরি করে বানানো।

সভ্যতা তোমার দিকে এগিয়ে দেয় নির্লজ্জ নেইল পলিশ।

যে নেইল পলিশের দাগ তুলতে পারে না

বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত মোছার জন্য তৈরি শান্তিপ্রিয় রিমুভার।

সভ্যতা তোমার ভার্জিনিটিকে ভালোবেসে উপহার দেয়

এক পাতা ফুলেল বার্থ কন্ট্রোলের পিল, যে পিলের

এয়ার টাইট কোটরে ঘুমিয়ে আছে যুদ্ধে হতাহত শিশুদের

শেষ ঘুম পাড়ানি গান। সেই গানের সাথে ঠোঁট মেলায়

তোমার শীৎকারের উন্মত্ত রেওয়াজ। দূরের জঙ্গলে

রূপসী বাঘিনী ডেকে ওঠে জোছনার আলোয় নিজেকে

সাজিয়ে, সঙ্গম শেষে প্রেমিককে হত্যার নকশা বুনে।

সুন্দরী, তোমার মেকাপের অতলে তুমি সদ্য জন্ম নেয়া

বন্য শিশু—যে নিজেই নিজের জন্মদাত্রী এবং ধাত্রী।

মেকাপের পুরু আচ্ছাদনের নিচে যে লুকায় না তার

বন্যতার রাত্রি। যার প্রেম ডানা মেলে প্রগতির

পোড়ো আবর্জনা শরীর থেকে খুলে ছুড়ে ফেললে আকাশে।

তুলে নিয়ে আবার পরিয়ে দিলে সে জড়োসড়ো হয়ে যায়

আতঙ্কগ্রস্ত শামুকের মতন। কুচক্রী কসমেটিকস জানে,

তুমি মানুষ না—তুমি ম্যানিকুইন। নাদুসনুদুস কুকুর

কোলে নিয়ে ক্যাটওয়াক করতে করতে তোমার গ্রীবা

জিরাফের মতো উঁচুতে উঠে যায় সুন্দর হওয়ার মহিমায়—

কোটি কোটি জন্মান্ধ দর্শকের সামনে জিতে নাও

বিশ্বসুন্দরীর মুকুট, পুরোটাই প্লাস্টিকের কৃতিত্বে।

তখন তোমারই নামের একটা গরীব মেয়ের

স্তন কেটে ফেলা হয় ক্যান্সারের উপশম করতে—

তার চৌদ্দগুষ্টির কারো সামর্থ্য ছিল না

ওখানে সার্জারি করে একটা প্লাস্টিকের স্তন বসাতে।

মরহুম ক্যামেরা

মরহুম ক্যামেরা! পরপারে যাওয়ার আগেই বন্ধ করে রাখ তোর পাথুরে চোখ—

ওই চোখে দেখা সব দৃশ্য শুধু স্থির হয়ে যায়—

অস্থিরতার দোযখের কারবালায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়া

এক উদ্বাস্তু শিশুর ক্লান্ত দেহের মতন।

মরহুম ক্যামেরা! ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার আগেই খুলে ফেল

তোর অনুভূতিহীন চামড়া। মানুষের আপাদমস্তক পোশাকের তলে

পোষা চিতার মতো অধৈর্য হয়ে বেড়ে উঠছে সময়। সে তার গালে বিরক্তির

ভাঁজ লুকাতে দিন রাত পড়ে আছে মেকাপ রুমের মোহে।

চামড়ার নিচে তার স্বাধীন পশু মধ্যরাতের তুষারপাতে

চাঁদের বোবা মুখের দিকে তাকিয়ে করছে হুংকার।

মরহুম ক্যামেরা! তোর লেন্সের অহংকার ভুলে যা হঠাৎ একটা বোমা এসে

গায়ে পড়ার আগেই। জন্ম থেকে যেসব ছবি তুই ক্যাপচার

করে রেখেছিস রোবট সৈন্যের মতো, সেই ছবিগুলো

হাত-পা কাটা ভিখারি হয়ে অসহায়তার গান গায়

যুদ্ধের আর্কাইভের ময়দানে, ‘একবার ছেড়ে দে মা, আমি পালাই...’

মরহুম ক্যামেরা! তোর নিপুণ স্মৃতিশক্তির কোনোই মূল্য নাই—

যতক্ষণ না তোর সাক্ষ্য প্রমাণের দায়ে ফেঁসে না যায়

অপরাধী মহাকাল। একের পর এক তোর বিবৃতি

বাড়াতে পারে ডকুমেন্টারির কাটতি, কিন্তু তাতে জুড়াবে না

সূর্যকে খুন করা এ ছদ্মসন্ধ্যার আড়ম্বর।

মরহুম ক্যামেরা! তুই বানাতে পারিস কোটি কোটি প্রফেশনাল যান্ত্রিক

চোখ। বানাতে পারিস সংবাদপত্রে দুঃসংবাদের গোলযোগ—

খবর ব্যবসায়ীর টাঁকশালে জোয়ার, জলোচ্ছ্বাস সর্বহারার ঘরে—

তুই পরাধীন আমৃত্যু তোর চালকের নিষ্ক্রিয়তার জ্বরে।

মরহুম ক্যামেরা! বহু রঙের ছবি তুলে তুই জেনেছিস

ভোগান্তির একটাই রং—কালো। যা আসলে রঙের অনুপস্থিতি।

নষ্ট টিভির বাক্সে একটা সাদা-কালো প্রজাপতি

বন্দি দেয়ালে খোঁজে রংধনুর খোলা দরজার চাবি।

মরহুম ক্যামেরা! অনেক ছবি তো তোলা হলো এ জন্মে—

তবু পারলি কি তুই ওগুলোর মধ্যে একটাও ছবি বদলাতে?

রক্তকে লাল টমেটো বা যুদ্ধকে বানাতে গ্রাম্য বিয়ের উৎসব? এই কলঙ্কে

তুই সমুদ্রে ডুব দিয়ে মর আর তোর বাক্সটা বেচে দিয়ে যা আমার কাছে।

আমি ওই বাক্সে জমাব পৃথিবীর পৌরাণিক হয়ে যাওয়া কান্না—

আর তা দিয়ে গড়ব সবচেয়ে সুন্দর আর ঐশ্বর্যশালী হীরা-মুক্তার গয়না।

অ্যাসাইলামকে লেখা চিঠি

একটা ট্যাবলেটের নিচে চিরে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে আমার পৃথিবী

একটা ক্যাপসুলের খোলে আটকা পড়ে আছে অবশিষ্ট নিঃশ্বাস

এক বোতল সিরাপে ডুবুরি হয়ে সাঁতার কাটছে

পালাতে চাওয়া আমার অসহ্য প্রেতাত্মা...

অ্যাসাইলাম! অ্যাসাইলাম! মস্ত বাঘের পেটের ভেতরে

গিলে খাওয়া সজারুর মতো আমাকে তুমি বমি করে উগরে দাও—

যাকে হজম করার সাধ্য এ জীবনে তোমার পাকস্থলির হবে না।

চিঠি লেখার আমার কেউ নাই—তাই তোমার হাত থেকে

নিস্তার পেতে তোমাকেই লিখছি চিঠি। সকাল সন্ধ্যা

তেতো ওষুধের পুরিয়ায় ফলক বাড়ছে আমার অকালমৃত সমাধির।

প্রিয় অ্যাসাইলাম! অনেক প্রেমের ছুটি পাওনা এ জীবনে—

অনেক প্রেমশূন্যতায় ঋণী তুমি আমার কাছে—

আকাশে তারাদের বসন্তে যে ফুল ফোটে তার দেখা

পায়নি কখনো সূর্য। জোয়ার আসার সময়ে সমুদ্র শুকিয়ে গেছে

অনুকরণ করতে গিয়ে মরুভূমির গাম্ভীর্য। অ্যাসাইলাম! এবার

পালাতে পারলে প্রেমেই হবো নৃশংস। মানুষের যুদ্ধরত

দেহ আর মগজ পাল্টে যদি যেতে পারে দুইজন

মানব-মানবী বন্য ভালোবাসার যুদ্ধে। বোমা আর

যুদ্ধের অস্ত্রের ক্ষত না হয়ে যদি হতো শরীর জুড়ে চুমুর চিহ্ন!

অ্যাসাইলাম! এবার পালাতে পারলে প্রেমে হবো নৃশংস।

যদি প্রেম ধিকৃত হয় তাহলে আঁতুড়ঘরের টাওয়েলে মুড়ে সেবিকা

কোলে নেবে জ্যান্ত গ্রেনেড। ফুলবাগানে আসবে ছুটে শ্মশানের সুগন্ধ।

প্রিয় অ্যাসাইলাম, সুস্থতার দাবি যারা করে তারাই বড়ো উন্মাদ।

পাগলের চিকিৎসা করে যে ডাক্তার সে নিজেই জানে না

তার রোগের বর্ণনা আছে কোন বইয়ের পাতায়। আকাশ জানে না

তার স্বাধীনতার সীমানা কতটা গভীর নীলিমায়...

একটা ট্যাবলেটের নিচে চিরে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে আমার পৃথিবী

একটা ক্যাপসুলের খোলে আটকা পড়ে আছে অবশিষ্ট নিঃশ্বাস

এক বোতল সিরাপে ডুবুরি হয়ে সাঁতার কাটছে

পালাতে চাওয়া আমার অসহ্য প্রেতাত্মা...

বৈপরীত্য যেখানে অস্বাভাবিকতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মাথা পেতে মেনে নেয়, সেখানে স্বাভাবিকতার সম্ভাবনা

বন্ধ্যা, বৃদ্ধ নারীর লোলচর্ম পেটে সন্তান উৎপাদনের স্বপ্ন হয়ে

লটকে থাকে অমাবস্যার চাঁদের মতন। অ্যাসাইলাম,

প্রিয় অ্যাসাইলাম! চলো আজ রাতে আমরা হাঁটতে হাঁটতে

কনসার্টে যাই আর তোমাকে দেখিয়ে দিই গিটার, বাঁশি,

ড্রাম, বেহালা সব নিয়েই অর্কেস্ট্রা। শুধু গিটার

বা শুধু স্যাক্সোফোন দিয়ে কোনোদিনও অর্কেস্ট্রা হয় না।

রৌদ্র দিনের গান

কুয়াশায় ডুবুরি হয়ে খুঁজছ যে সূর্যের সোনার থালা

সেই থালা ভেসে উঠছে তোমার চোখের বিষণ্ন সরোবরে।

চোখের ভেতরে যে রূপবতী রৌদ্র দিনের গান—

জন্মান্ধের মতো তাকে হন্যে হয়ে হাতড়াচ্ছ চোখের বাইরের পৃথিবীতে।

দৃষ্টি আছে স্বচ্ছ, দেখতে সে পায় ঈগলের নির্মম থাবায় জমানো আদর

পথ-ঘাট-বাড়ি-বাগান-খেলার মাঠ সবই আছে যেখানে যা থাকার কথা—

তবু কেন কুয়াশায় কানামাছি খেলি তুমি আমি—

সবকিছু থেকেও কুয়াশায় অন্ধ আমাদের দেখার প্রবণতা।

স্মোকিং মেশিন থেকে বের হওয়া ঘন কালো ধোঁয়ার মতো

কুয়াশায় ভরে যাচ্ছে প্রতিটা ফাঁকা জায়গা—

চোখ বাঁধা ম্যারাথন রেসে পা নামিয়ে বুঝি

সমুদ্রের অতলে ডুবে যাওয়া জাহাজের শেষ নিঃসঙ্গতা।

কুয়াশায় ডুবুরি হয়ে খুঁজছ যে সূর্যের সোনার থালা

সেই থালা ভেসে উঠছে তোমার চোখের বিষণ্ন সরোবরে।

সকাল দিয়েছে ফাঁকি তাই রাতের পর রাত জাগছে রাত্রি—

হতাশার বহর তার কাফেলা নিয়ে রওনা দিচ্ছে চির সূর্যের দ্বীপে।

একা অসীম কুয়াশার মাঝে কালো ছড়ি হাতে হাঁটছে মহাকাল—

অক্টোপাসের আলিঙ্গনে সাগরের বেরিয়ে যাচ্ছে জান।

কোনো কিছু শুরু করার যখন নেই নির্দিষ্ট কোনো নাম—

যাকে অপচয় ভেবে ফেলছ ছুড়ে সেখানে গান গাচ্ছে ঝলমলে সকাল।

সারা শহরে শীত চালান করে সূর্য লুকায় উদ্বাস্তু শিশুদের কোলে

পাখির ডানায় উড়ে গিয়ে আকাশে ওরা ফুটবল খেলে সূর্যটাকে নিয়ে

সূর্যই এখন হাড়হাভাতে একমাত্র সম্বল ফায়ারপ্লেস—

তোমাকেও দেখি সেখানে পোড়াতে এসেছ নৈরাশ্যের সিগারেট।

কুয়াশায় ডুবুরি হয়ে খুঁজছ যে সূর্যের সোনার থালা

সেই থালা ভেসে উঠছে তোমার চোখের বিষণ্ন সরোবরে।

চোখের ভেতরে যে রূপবতী রৌদ্র দিনের গান—

জন্মান্ধের মতো তাকে হন্যে হয়ে হাতড়াচ্ছ চোখের বাইরের পৃথিবীতে।

চাকরিজীবীর গান

হাতে হাত বেঁধে আমরা কাজে যাই

যেভাবে কাজ করতে যেত শিকলে বাঁধা ক্রীতদাস

আমাদের কোনো শিকল নেই কিন্তু গলার টাই হলো মরণ ফাঁস

নিজেকে বেচে কিনি খুচরা সদয়, বাচ্চার দুধ আর প্যাম্পার্স—

হাতে হাত বেঁধে আমরা কাজে যাই

আমাদের হাত বাঁধা আছে ঋণের আগাম ফাঁদে

মাসের অর্ধেক যেতেই পকেটে ফাটে ইসরায়েলি বোমা

বারান্দায় লকলক করে মানিপ্ল্যান্টের চারা তবু মানি বেচারা

বহু কষ্ট পেয়ে ছেড়ে গেছে এ ঠিকানা—

মাটির ব্যাংক ভাংলে ভেঙে যায় একদলা অন্ধকার—

মেঝেতে গড়াতে গড়াতে থামে সবেধন নীলমণি একমাত্র ফুটো পয়সা।

হাতে হাত বেঁধে আমরা কাজে যাই

সূর্য ডোবারও অনেক পরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে গাই না ফেরার গান

বাড়িভাড়া বাকি তিন মাস—সকাল সন্ধ্যা তাই বাড়িওয়ালার হুংকার

মানুষের জঙ্গলে দেহের পূর্ণিমা ভাড়া খাটাতে আসে চাঁদ।

হাতে হাত বেঁধে আমরা কাজে যাই

কত হাত বদল হয়ে গেল পৃথিবীর সোনার রুপার কৌটা

মরুভূমির গভীর থেকে চিরকাল একটা কঙ্কালের হাত বের করে আছে অভাব

জুয়ার টেবিলে ঘোরে জীবন আর মৃত্যুর দা-কুমড়ো স্বভাব।

হাতে হাত বেঁধে আমরা কাজে যাই

অনেক কাজ তো করা হলো এ জীবনে

না করা কাজ স্বপ্নের খাঁচা খুলে ছাড়ে শেষ নিঃশ্বাস

কোকিলের মতন নিজের সন্তানকে দিই পরের বাসায় বড়ো হওয়ার আশ্বাস।

হাতে হাত বেঁধে আমরা কাজে যাই

অন্ধ নই, শুধু সামনে দেয়াল আর পেছনে শ্বাপদের নির্মম খেয়াল

হেলায় হেলায় মানব জনম যায় না বয়ে যায় না—

মাস শেষে ফিকে হয়ে আসা রক্ত বেচে কিনি রং আর ক্যানভাস।

জ্বর

আমার নাক থেকে বেরুচ্ছে ড্রাগনের জ্বলন্ত নিঃশ্বাস

মুখের গভীরে ছড়িয়ে পড়ছে সাংঘাতিক দাবানল

সারা শরীর যেন চিতায় পোড়ানো এক টুকরা অঙ্গার

যাকে ছুঁতে যাই সে-ই পুড়ে ছাই—

আমি এক মানবিক জঙ্গলের জন্তু।

নরকে নির্বাসিত হওয়ার আগে নিজেই হয়ে গেছি নরকের অগ্নিকুণ্ড।

আমার রোমকূপে বিস্ফোরিত হচ্ছে ধাবমান বোমা

জিহ্বা যেন খরার দেশের তৃষ্ণার্ত হোমোসেপিয়েন্স

রক্তে যাচ্ছে বয়ে আগুনের নীলনদ

বৃষ্টির খোঁজে বেরিয়ে এলাম বাইরে—

কিন্তু না, বৃষ্টি ঝরাচ্ছে তরতাজা আগুনের হল্কা

সে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর ধরা ছাতা।

আমার চোখ পুড়ে গেছে তোমার উদোম সৌন্দর্যে ঝলসে যাওয়ার আগেই।

পায়ের নিচে জমে যাচ্ছে সূর্যের তপ্ত থালা

আমার অস্তিত্ব গলে যাচ্ছে একদলা রঙিন মোমের মতন

গলে গলে বয়ে যাচ্ছি অচেনা সমুদ্রের উপকূলে আরোগ্যের অন্তিম আশায়।

প্রেম! তোর নীলাভ জলে ডুবুরি হয়ে কুড়াতে চেয়েছি

পুনর্জন্মের বিরল মণিমুক্তা। কিন্তু তুইই দিলি মৃত্যুদণ্ড

শুধুমাত্র হৃদয়ের ঊষর মরুভূমিতে ফুল ফোটানোর দোষে।

শীতল ঝরনা ভেবে যাকে চাদরের মতো জড়িয়ে নিতে চেয়েছি

সারা গায়ে, সে-ই আগ্নেয়গিরির লাভা হয়ে আলিঙ্গনে করেছে দগ্ধ।

পরিত্যক্ত সমুদ্রের তীরে অচল জাহাজের মতো পড়ে আছি

পার না হওয়া ক্লান্তির বালু মেখে আপাদমস্তক।

দূর দিগন্তে ওড়া গাংচিল, তোমরা

ডানা থামিয়ে নামো এ দেহের ভস্ম দ্বীপে।

ধারালো ঠোঁটে ছিঁড়ে নাও ব্যথাতিক্ত রক্ত আর মাংস—

নীলাভ সমুদ্রের জলে তারপর হোক একা কঙ্কালের শেষ স্নান।

দার্শনিক বিরতি

তুমি বলিলে, তিন রাত আর চার দিন ধরে অফিস করিতে করিতে

অফিসেই তোমার ডেলিভারি হইয়া গিয়াছে!

সে বলিল, কয়েক মাসের ভাড়া বাকি পড়ায়

বাড়িওয়ালা আসিয়া তার নিজের জানের চাইতে প্রিয়

গিটারখানা লইয়া গেছে। কান খুলিয়া দিলে পলাশীর আম বাগানে

তোপ দাগানোর মতন আরো বহু বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

আমি তো lucky guy, তাই এগুলা দেখিতে পাই—

মরার পর দোজখে গিয়া friendদের কাছে বলিতে পারিব :

পৃথিবীর সবচেয়ে অঘটনমুখর সময়ে আমি ছিলাম জানো!

এতো অঘটন এঁটে রাখতে পারিতেছে না কয়েকশ কোটি খবরের

কাগজ। এসবের সাক্ষী শুধুই আমাদের অসীম অসীম

টেরাবাইটের মগজ। চব্বিশ ঘন্টা tyranny আর দৌড়ানির উপ্রে আছি man!

পেইনের ভারে গলা পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে কবরের মাটিতে—

মাথার ওপর দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচা বিল্ডিং ভাইঙ্গা পড়িতেছে টেনশনে।

পালাবি কোথায় শয়তান? যেদিকে যাবি তোর পিছে পিছে

তাড়া করিতেছে আজরাইলের তুখোড় মেশিনগান। তোমার দুঃখে bro

আমার কলিজাটা কারবালার মতন হাহাকার করে।

তোমার কষ্টে dude, আমার হৃদয় গ্রিনহাউজ ইফেক্টের ন্যায়

গলে গলে যায়। আমার দুঃখ-কষ্ট-অভিমান-অভিযোগ-আক্ষেপ

তখন আর কিছুই মনে হয় না। মনে হয় এই tyranny, এই দৌড়ানি সবই fake—

আমরা যে যাহার চিত্তের সন্ত্রাসে কার্টুন শো'র মতো এগুলার সামনে সামনে

দৌড়ায়া ভাবিতেছি, আমাদেরকেই ধাওয়া করা হচ্ছে। চামে একটু সাইডে সরলেই

আপনি বুঝতে পারবেন, এহেন ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সঙ্গে আমাদের

কাঁহাতক কোনো সম্পর্ক নাই। আকাশ ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে মাথাতে পড়ুক—

রাস্তাঘাট ভূমিকম্পে ফাটিয়া চৌচির হয়ে যাক। প্রচণ্ড এক ঝড় এসে উত্তর মেরুর

ক্যাঙ্গারু উড়িয়ে নিয়ে ফেলুক দক্ষিণ মেরুর ভ্যাড়ার মাঠে। তথাপি—

Yo mama, চলো আমরা বসে বসে ধ্যান করি। কোথা থেকে এলাম,

কোথায় যাব, জীবনের কী উদ্দেশ্য, কে আমি—এসব প্রাচীন questionএর

নতুন করে answer খুঁজি। বর্তমান যত ক্রিটিকাল হোক baby,

তুমি নিজে নিজেকে বলো : I just need a দার্শনিক বিরতি।

পুনর্জন্ম

তোমাদের যন্ত্রময় হৃদয়ের কাছে প্রেম চেয়ে

নাকানিচুবানি খেতে হলো এতবার—

দেখো আমার হাতে পুড়ে যাওয়া মেঘের দাগ

চুমু নয়, ঠোঁটে লেগে আছে বিষাক্ত তিরের আঘাত।

তার চেয়ে প্রেম নয়, ঘৃণা হোক জীবনযাপনের সহায়।

সাগরের তীরে পড়ে আছে অসুস্থ সময়ের ফসিল

পচা মাংসের আহামরি গন্ধে মাছিরা করছে কিলবিল

যে মাছির পঙ্গপাল উড়ে আসে সূর্যের তাপে

ঝলসানো তিমির শুটকি হতে—

সেই সূর্যের তাপে শুকিয়ে যাক পৃথিবীর সব ঔষধ ভরা বোতল।

আরোগ্য নয়—সেরে ওঠার জন্য চাই আরো প্রকট অসুখের আয়োজন।

ভেঙে যাওয়া হাটের চাতালে তুমি আর গেয়ো না প্রেমের গান—

অন্ধ চোখের আকাশে মুক্ত করে দাও ডানা কাটা কবুতর।

আকাশ উড়ে যাক মৃত প্রজাপতির ডানায়। কৃষ্ণগহ্বরের ফুলে

পাখিরা আকাশ না পেয়ে মাথা গুঁজে

ডানার লাঙল দিয়ে চষে বেড়াক ধ্বংসস্তূপের উর্বর জমিতে।

ভালোই যদি বাসো তাহলে তাকে আহত করতে দ্বিধা কোরো না

সুন্দরকে ভালোবাসতে চেয়ে মানুষ বিয়ে করে ফেলে বীভৎসতাকে

শান্তিকামী বলেই আমরা রক্ত ছাড়া একটা দিনও কাটাতে পারি না

তোমাকে ভালোবাসি তাই তোমার কান্না দেখে সুখ পাই

বাগানে ফুটে থাকা চাঁদের ছুরি নিয়ে তোমার বুকে চালাই...

হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে অর্ধমৃত পৃথিবী—

তার জরুরি চিকিৎসা দরকার অথচ ডাক্তার নিজেই রোগী।

কুমারী রোগিনী প্রসব করছে এক জীবন্ত কঙ্কাল শিশু

সরোবরে ঢিল ছোড়ার মতো ছড়িয়ে পড়ছে জীবাণুর ঢেউ...

আহ জীবন! তোমাকে বাঁচাতে হলে আগে তোমাকে খুন করা দরকার

নির্জন মরুদ্যানে বসন্তের সৎকার করে দাঁড়িয়ে আছে একা ক্যাকটাস।

কবির শাস্তি নরকের আগুন

পৃথিবীর শেষতম কবির মৃত্যুর পর কবিতা উৎপন্ন হবে মেশিনে। চাইনিজ কবিতা এসে দখল করে নেবে এশিয়ার বাজার। রাশান কবিতা গুষ্টি উদ্ধার করবে আমেরিকান কবিতার মার্কেটের।

ব্রেন মর্টগেজ দিয়ে আমি তো পালাতে চেয়েছিলাম অন্ধ, মূর্খ, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর শরীরসর্বস্ব জঙ্গলে!

মেশিন তোমরা কে কে ভালোবাসো? আমি বাসি—কারণ মেশিনের মৃত্যু নেই। মেশিন কখনো কার্পণ্য করেনি মানুষের হৃদয়ের অনুকরণে।

এই নরম, সোনালি বিকেলে তোমার জানালার গ্লাসে সূর্য চুমু খায়। হাত দিয়ে স্পর্শ করতে চেয়ে বারবার মন খারাপ হয় তোমার। আসলে তুমি এখন দিন-রাতের বাইরে অন্য কোনো গ্রহে তাঁবু পেতে সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে মেলামেশা করতে শুরু করেছ। এখান থেকে আমি তোমাকে দেখতে পাই—বসনিয়ার শিশুদের কঙ্কালের মতন তুমি চোখ বন্ধ করে সময় পার করছ কোমায়!

অমাবস্যার রাতে শঙ্খজোঁক ভরা নদীতে বুনো মহিষের পালের মতো পার করি অসময়...

তোমাকে ভুলে আবার তোমাকে চিনতে শুরু করি। পরাজিত হয়ে আশ্বস্ত হই আবার শানাতে হবে গোড়া থেকে। শূন্য, কেবলি শূন্য মুহূর্তগুলো বিদিশা করে দিলেও জানি ফিরে আসবে সব তুচ্ছ তুচ্ছ অনুভূতির অপার অর্থ।

কবিতা ছাড়া মানুষ কোনো উদ্ভিদহীন শহরের মতো বন্ধ্যা, অদ্ভুত।

মরুভূমির মতো জ্ঞানী কিন্তু প্রেমহীন।

অক্টোপাসের মতন থকথকে, ঘিনঘিনে, ভয়ংকর।

যেখানে কবিতারা পুরানো সিএনজির ইঞ্জিন হয়ে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে আরো অনেক অনেক পুরানো একটা লাইব্রেরির একমাত্র কবিতার বইয়ে ধুলার আদর সহ্য করে। অথচ ফার্মে বাড়ছে মুরগির চাষ, শিশুগুলো তালগোল পাকানো গোলাকার, গাড়ি কেনায় এক ব্র্যান্ড থেকে আরেক ব্র্যান্ডে সুইচ করছ প্রতি মাসে। তোমাদের বাচ্চাদের সাথে খেলা করে রোবট, নব্বইভাগ কাজ করে দেয় চাকর মেশিন। তোমরা কনফারেন্স করো যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে, কাউন্সিলিং করো সিলিং ফ্যানের শান্তিযুক্ত বাতাস নিয়ে। তোমাদের কাছে কবিতা ডিলডোর মতো অনুৎপাদক এক সৌন্দর্যের নাম।

বহুকাল কোমায় থাকতে থাকতে যখন সবাই ভুলে গেছে তার কথা, তখন একদিন অভিমানী কবিদের দেখে দেখে কবিতাও করে আত্মহত্যা।

পৃথিবীর শেষতম কবির মৃত্যুর পর বিচারের আগে আগে সবাই যখন পালাচ্ছিল স্বর্গ থেকে নরক আর নরক থেকে স্বর্গের ঘুরপাকে, তখন হঠাৎ ধাক্কা খায় কবিতা আর কবি। আত্মহত্যার অপরাধে ঈশ্বর কবিতাকে নরকে নির্বাসন দিয়েছে শুনে অন্তহীন অপরাধবোধে কবি ঈশ্বরের কাছে চায় তার নিজের মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু একবার মরার পর দ্বিতীয়বার কাউকে মৃত্যুর অনুমতি দেয় না ঈশ্বর। কবিতা নরকে জ্বলতে থাকে অনন্তকাল আর কবিতার পরিণতির জন্য কবি নিজেকে দায়ী করে জ্বলতে থাকে নিজেরই মনগড়া নরকের শীতল আগুনে।

কালো সূর্যের বল

ফুলের চেয়েও সুন্দর, অ্যাঞ্জেলের চাইতেও নিষ্পাপ হলো শিশু। সেই শিশুদের খুন করে তুমি তার নাম দাও মানবাধিকার! মানব আর অধিকার শব্দ দুইটার মাঝখানে উহ্য থাকে যে শব্দটা, সেই শব্দটা একটা ঘাতক বোমা হয়ে প্যালেস্টাইন ওয়াল টপকে চলে আসে শিশুদের বাগানে।

একটা বেলুনের হার্ট—তার ভেতরে তাজা, উষ্ণ, ছলছলে রক্ত। যুদ্ধের দৈত্য বারবার সেই বেলুনের হার্টটা ফাটিয়ে রক্ত ছিটাতে ভালোবাসে। সেই রক্তের রং কারখানায় শুকিয়ে বানায় আর্টিফিসিয়্যাল শান্তির কবুতর।

পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই আমি ছুটে যাই তোমার দিকে—সবখানে ব্ল্যাক ম্যাজিকের মতো গজিয়ে ওঠে সাদা, নির্বিকার এক দেয়াল।

কয়েকদিন আগেও যারা সংগীত হয়ে বাজত ঘরের মধ্যে, ম্যাডোনার কোলে জোনাকির মতো জ্বলত যিশু হয়ে, প্রজাপতির মতো খেলত ঘাসের স্বর্গে—তারা এখন ফ্যাশন হাউজের ছোটো ছোটো ডল-এর মতো পড়ে আছে নাক, চোখ, হাত, পা, মাথা হারিয়ে গোরস্থানে যাওয়ার অপেক্ষায়।

আমার এই কবিতা খুব বেশি অক্ষম তোর জীবনের আলোটা জ্বালিয়ে দেয়ার কাজে। আমার দীর্ঘশ্বাস যেতে যেতে বড়োজোর ওই প্যালেস্টাইন ওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ওখানেই থেমে যায়।

ব্যাংকসি! ছিঃ ছিঃ! কী হলো তোমার প্যালেস্টাইন ওয়াল পেইন্টিং করার মিশনে? তোমার ছবি, আমার কবিতা, আমাদের শত শত ভাষায় লেখা পেপারের হেডলাইন—সবই নিষ্ক্রিয় মাইন হয়ে লুকিয়ে থাকে চাঁদের পেটের জন্মান্ধ পাহাড়ে।

গাঁজা খেয়ে তুমি আর কত নেশা করতে চাও? তোমার এ গাজার নেশা ক্যানিবাল হয়ে খায় জ্যান্ত মানুষ। যাদের কাছে তুমি ইসরাইল না, আজরাইল—সেই আপন বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি মেশিনের পুতুলের মতো পূরণ করছ আসল আজরাইলেরই ইচ্ছা।

যে ধর্ম মানুষকে উৎসাহিত করে মানুষ হত্যায়, যে সভ্যতা অস্ত্র ব্যবসা করবে বলে বিকৃত, প্রতিবন্ধী একেকটা যুদ্ধ জন্ম দেয়—এমন সভ্যতার চাইতে আদিম বন্যতাই ভালো। এসব ধর্মের মুখোশ, রাষ্ট্রের মুখোশ, সভ্যতার মুখোশ নাই সেখানে, এই সভ্যতা বহু আলোকবর্ষ পিছিয়ে ঘুমিয়ে থাকুক সেই বন্যতার মরা বাইসনের অণ্ডকোষে কালো সূর্যের বল হয়ে।

প্রেম যেন এক দরিদ্র হতভাগা দেশ

প্রেম যেন এক দরিদ্র হতভাগা দেশ

বিত্তশালী দেশের দান দক্ষিণায় জোটে তার

দুই বেলার পান্তাভাত, কাঁচামরিচ।

বহু গলগ্রহে ছাদের এবড়োখেবড়ো ইট

আর রডের ভেতরে সবুজ মাথার ঝুঁটি উঁকি মারে।

মৌলিক চাহিদার ব্যস্ততাও হয় বুঝি মৌলিক—

তাই পাখি নয়, অ্যারোপ্লেনেই মানব প্রজাতির বিস্ময়।

লাল জবা ভর্তি স্নানঘরে থইথই বিমর্ষতা—

ফুল থেকে ফল হওয়ার পথে সামাজিক বাঘেদের

ডোরাকাটা বাধা। অন্ধ মেয়ে জানালাকে বলে

কিছুক্ষণের জন্য তার চোখ হতে। চোখে নড়েচড়ে ওঠে

বাঁশ বন। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যায় দুপুরের

নিমগ্ন হাওড়ে। মানুষেরা ভালোবেসে সেই পাখিগুলাকে

ডাকে সময় বলে। শবদেহ ছেড়ে দ্রুতগতিতে নেমে যায়

একটা কালো পিঁপড়া—

ঘুমিয়ে কিংবা জেগে জন্মান্ধ নারী দেখে সুন্দরের রুপালি ডানা

বাস্তবের কোনো ডাকাত, ছিনতাইকারী বা সেনাবাহিনী

তাকে ফেরাতে পারে না। কারণ সেই সুন্দর উৎপন্ন হয়

তার হৃদয়ের আকাশছোঁয়া কারখানায়।

রোদ্দুরমাখা বালুচরে হেঁটে যায় নিখিল কাঁকড়া—

তার পায়ের ছাপে লোকজ আল্পনা।

সমুদ্রের উত্তালতা দেখে সন্ধ্যাবেলা

অসংখ্য জুটির মধ্যে একাকী কোনো পর্যটকের

ঘুচে যায় একা থাকার ম্লানিমা।

চোখ ভরে ওঠে জলে—

জল সে তো জোয়ারের কথা বলে।

কাঁটায় ছড়ে যাওয়া পা কান্না আনে না

গাছটাকে তার বাঁচাতে হবে পোকামাকড়ের হাত থেকে।

প্রেম থাকুক বেঁচে—

সে যেন আর কখনো না হাঁটে পরাজিত কর্নেলের মতো

ক্র্যাচে ভর করে।

রাষ্ট্রনায়ক বরং এফডিসি-তে ঢুকে অ্যাকশন হিরোর ভূমিকায় নামুক!

আমি বুঝি না কেন হাজার হাজার ভোট দিয়ে কিছু শঠ নির্বাচন করা হবে আর সেই শঠগুলো মাথার ওপরে উঠে ধুমধুম করে হাতুড়ি পেটাবে। সেই শঠগুলো জোঁকের মতো সব স্বস্তি, সম্পদ, সুন্দর শুষে নেবে। শঠগুলোর গাড়ি রাস্তা ব্লক করে সবাইকে থামিয়ে নিজে আরামসে চলে যাবে। শঠগুলোর বাড়ি দেশেবিদেশে দুর্গম রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। শঠগুলো সোনার কয়েন খেয়ে সোনার কয়েন হেগে সেই কোষ্ঠকাঠিন্যে মঞ্চে উঠে বন্য মহিষের আর্তনাদের মতো চেঁচাবে।

তাহলে বৃষ্টির মতো ঝরা ঘাম আর দারিদ্র্য আর অসংখ্য কিলবিল করা মানসিক রোগের বিনিময়ে শঠগুলোকে নির্বাচিত করতে হবে কেন? জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে না বলে? কৃষকরা সংবিধানের ধারার ধার ধারে না বলে? রিকশাওয়ালা রাজনীতির জিলাপি ভাজতে পারে না বলে? কিন্তু আমি তো দেখি রিকশাওয়ালা, চায়ের দোকানওয়ালারাই রাজনীতি নিয়ে প্রকৃত উদ্বিগ্ন। আবহাওয়ার খবর তারাই রাখে, যারা সমুদ্রের ধারে থাকে। যার জামাই ডিঙ্গি নিয়ে সমুদ্রের হৃদয় খুঁজতে বের হয়। তাহলে কৃষক, গার্মেন্টস কর্মী, ঝালাইকার, রাজমিস্ত্রী, বাসের ড্রাইভার—এদের দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব না; হবে কেন? যে বাস চালাতে পারে, সে রাষ্ট্রও চালাতে পারে। যে একপাল গরু সামলাতে পারে, সে রাষ্ট্রের জরুরি অবস্থাও সামাল দিতে পারে।

ফাকিং সাম্যবাদ

জলপাই বনে ঝরে রংধনুর ঝরনা থেকে ফাউন্টেন পেনের ডগায় জমানো শিশির;

সাদাকালো মুখ থ্যাবড়ানো বস্তির মাথায় আশাবাদী কমলা রং নিয়ে বসে সূর্য।

পড়ে থাকা জলপাইগুলো কেউ কুড়ায় না, কয়েকটা মাছি বিরক্তি নিয়ে

উড়ে উড়ে বসে সেগুলোর ওপর। বনের পাশে কার্লি হেয়ারের মতো আঁকাবাঁকা কালো

কাঁটাতারে বিঁধে আছে একটা শিশুর লাশ। তার মা যেভাবে তার স্কুল ড্রেস ধুয়ে শুকাতে দিত,

সেভাবে শুকাচ্ছে সে বৃষ্টিতে আর রোদে। ক্রিকেট খেলতে গিয়ে তার বল চলে গিয়েছিল

পাশের দেশে। বলের উল্টোদিক দিয়ে একটা বুলেট এসে তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে,

আর তার রাবারের বল গড়াতে গড়াতে চলে যাচ্ছে দেশের দেয়াল টপকিয়ে নিরুদ্দেশে...

রাষ্ট্রের অসুখে কফের মতো মরিচা জমে জমে সীমানায় ঘন হচ্ছে কাঁটাতার,

মনের সীমানায় কাঁটাতারগুলো মুছে যাচ্ছে নিষ্পাপ স্বার্থপরতায়।

রাষ্ট্র এক সাইকো কয়েদখানা, আমরা হলাম সেই কয়েদখানার নীল আদমশুমারিতে

ধরা পড়া দাবার ছকের পোশাক পরা কয়েদি। জন্মান্ধ জোছনায় সেলের বাইরে দেখি

আমাদের দাবার ছকের পোশাকগুলো ডোরাকাটা হয়ে ঘাস খায় মহীনের জেব্রাগুলি।

কান্নার জোয়ার এত অবিরল যে, এখন কান্নার বাজারমূল্য একদমই ফ্লপ।

তাই ভাটার চরে আটকে পড়া নৌকার কঙ্কালের মতো বিরল হাসি—

জোয়ারে ভেসে যাওয়ার আগেই কুড়িয়ে এনে শীতরাত্রির আগুন জ্বালাই।

তুমি আমার সাথে যত বড়ো প্রতারণাই করো, তা আমার কাছে নেহাত তুচ্ছ।

রাষ্ট্র প্রতারিত করে নির্বিশেষে তোমাকে আর আমাকে ফাকিং সাম্যবাদে।

ফুঁ...

অনেক রাতে অজান্তে থেমে গেলে ঝড়

বৃষ্টি নামে। জেলেনৌকার শেষ কুপি নিভে যায়

ক্লান্ত ফুঁ-য়ে। তখন আকাশ জানালা খুলে

কিছু আলো বাইরে আসতে দেয়।

বাইরে আমি বসে আছি জীবন্ত প্রেত...

রোদে চামড়া পুড়ে যায়, বর্ষায় ফাঙ্গাস।

এ এমন সময়—জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে

আয়নায় ভাসে নিজের রক্ত-গঙ্গা লাশ।

সম্পদ—এক মুঠো ভাষা।

তারারা নীরব।

সবাক চলচ্চিত্রে অভিনয় শিখে

বাড়িয়ে চলেছি অপরিচয়ের পারাপার।

সকালে ঘুম ভেঙে তোমার দরজায় উপস্থিত হব

ভীষণ অচেনা কিছু শব্দফুলের তোড়া নিয়ে নির্লজ্জের মতো

তোমাতে আমাতে পুরনো সেই মিলনের লিপ্সায়।

ক্রসফায়ারের গোপন পরোয়ানাকে পরোয়া করো না

মধ্যরাতে নদীর মতো বয়ে চলা ব্যস্ত স্বপ্ন

ভেঙে যদি ডাক পড়ে ক্রসফায়ারের!

একটুও বিস্মিত নই আমি—

চিন্তিত নই এ কি স্বপ্ন, না কি বেঁচে থাকার বিভ্রান্ত ফলাফল...

কালো মুখোশবন্দি মুখগুলো করে বিচার

তাদের জন্মান্ধ চোখের দুরবিন দিয়ে

তাদের বধির শ্রুতির সরবতা দিয়ে

তাদের অসাড় নাকের ঘ্রাণ দ্বারা শুঁকে

তাদের পচে যাওয়া মগজের সংবেদনশীল অহমিকা দিয়ে।

আমার এতদিনে শেখা যত শব্দ আর বিপরীত শব্দ

হঠাৎ পাথরের চেয়েও বেশি ভারী লাগে।

সত্যি, মিথ্যা এক হয়ে যায় একটা বুলেটের মধুর আওয়াজে—

অস্ত্রের কারখানায় বেওয়ারিশ লাশ যার

সে ছিল এ অস্ত্র কারখানার পুরাতন মজুর।

তার বুকে জমানো মাটির টবে চাষ করা লাল গোলাপের বাগান

থেকে ফুল নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এক্স বউ

আর অকালপক্ক কিশোরী মেয়ে পহেলা বৈশাখে

লাল শাড়ির সাথে ম্যাচ করে প্লাস্টিক চুলের খোঁপায় পরে।

এখানে প্রচুর ধোঁয়া মেঘ হয়ে ঘোরাঘুরি করে

এখানে কোনো জানালা নেই, শুধু একটাই দরজা

মর্গের ময়দানে খোলা।

এখানে নানান জাত-বিজাতের মানুষের অভিশপ্ত চাওয়া পাওয়া...

আমি যতবার তোমার সাথে ঝগড়া মিটিয়ে

অভিমানের কাছে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিই

ততবার আমার মৃত্যু কোজাগরি পূর্ণিমা হয়ে দূরে সরে যায়

তোমার শহরে ব্ল্যাকআউট চিতার অরণ্যে।

তোমার বাড়ির দিকে যেতে গিয়েই নিখোঁজ হলাম

তুমি শাহবাগের মোড় থেকে কয়েকটা দোলনচাঁপার

স্টিক কিনে আমার কবর খুঁজতে খুঁজতে

পুরো পৃথিবীটা পেয়ে যাও।

মানচিত্রের রেখার মতো সুড়ঙ্গ খুঁড়ে গভীরে বাড়ছে

সেই কবরখানার পরিধি। উপরে কিংশুক ঘাসের বন্যতায়

বাসর সাজাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে হলুদ-খয়েরি প্রজাপতি।

ছোটো ছোটো কালো দেবদূত

ছোটো ছোটো কালো দেবদূত

কোণঠাসা আঁধারের বনপথ

গড়িয়ে পড়তে লাগল,

অফুরন্তকাল ঝরতে লাগল ঘামের শাওয়ারে,

তবু পেল না কোনো কম পয়সার

রেস্টুরেন্টের খাবারের মতো হলুদাভ আস্বাদ।

যে বনে কোনো গাছ ছিল না...

আকাশে ছিল না তারাদের আল্পনা

জল্পনা কল্পনা নিয়ে আসেনিকো চাঁদ

শিশুরা তাই তাদের ফ্যাকাশে চামড়া ওঠা হাত

ময়দার মতো ঝেড়ে

চোখের জলের লবণ মাখিয়ে

তাদের অভিমানী ফুসফুসের মতো ফুলে ওঠা

রুটি বানিয়ে খেয়ে হয়েছিল

নিজেই নিজের উত্তাপের উৎসহীন উৎস।

এখানে সব কিছু ঝিম মেরে আছে।

নাগরদোলার চাকা থেমে আছে

প্রেমের মতো।

হৃদয়ের শীতে বাইরের মরুভূমির প্রখরতা

জমে জমে হয়েছে কুখ্যাত বরফ।

বইয়ে দাও বইয়ে দাও

সূর্যের আলোর ফলা হয়ে কাটো

আমার যত শিকড় গজানো পাথর কবিতা।

ও সূর্য! বলো না, যত খাপছাড়া কাণ্ডই ঘটুক

সবার আগে বাঁচাটা জরুরি।

বলো না, এ এক কুয়াশা ঘেরা জঙ্গল,

বিচিত্র প্রাণীর বিচিত্র ভণ্ডামি

সয়ে যাওয়াই জীবন।

ও সূর্য! তোমার আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরে

পচে ওঠে বেহুঁশ সময়ের বেওয়ারিশ লাশ

আর তার ভেতর মোমহীন স্যাঁতসেঁতে বাতাসে

মোমবাতির সবুজ জ্বলজ্বলে স্ট্যান্ড

হয়ে উঠে দাঁড়ায় আজীবন সহিষ্ণুতার কফিনে

ঘুমিয়ে থাকা অসহিষ্ণু কঙ্কাল।

ওহো সূর্য! এই বিতৃষ্ণা সাজাব না আর

মেকাপের রঙে। এই ঘৃণা লুকাব না

লাল রক্তের মধ্যে গোপন কালো রক্তদোষে।

এই প্রতিবাদ খাঁচায় বন্দি সুসভ্য বাঘ,

এই ধ্বংস সৃষ্টি গড়ে ভাঙনের চিড়িয়াখানায়।

এই আক্রোশ ডানা মেলুক ভুলে যাওয়া বন্যতায়।

চলো, দেয়ালের শেষে বিমূর্ত গরাদ তুলে দিই।

ভালো আর সুন্দর ছুড়ে ফেলি অবলীলায়।

কাঁটাচামচ

ঘুমিয়ে পড়া সমুদ্রের শিয়রে একটা ফানুস

উড়তে উড়তে প্রজাপতির মতো উঠে যাচ্ছে ওই আকাশে।

বহু বহুদূর মরুভূমি থেকে পানির খোঁজে হামাগুড়ি দেয়া

একটা পোকার মতো আমিও হাঁটছি তোমার উদ্দেশ্যে।

আরো দূরে সরে যেতে যেতে ফানুসটা মিশে গেল তারার দেশে—

তারা খসে পড়ে কুয়াশার দ্বীপে, আমি আর আমি ছাড়া এখানে আর কেউ নেই।

সূর্যের জীবন্ত কবরখানা থেকে গরাদ ভেঙে

তুমিও পালিয়ে আসছ আমার কাছে, অমাবস্যার মশাল জ্বেলে

পৃথিবীর দুইপ্রান্ত থেকে দুজন উলঙ্গ মানুষ

যারা দেখতে ঠিক যেন সেই সমুদ্রতীরের ফানুস—

ছুটে আসছে পরস্পরের দিকে মিসাইলের চেয়েও দ্রুত গতিতে

যাদের দুজনেরই দুজনকে দরকার অক্সিজেনের মতো

যাদের দুজনেরই দুজনকে দরকার সবচেয়ে অজরুরি প্রয়োজনে।

তাদের সামনে সংবিধানের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এসেছিল বুড়ো রাষ্ট্র।

তাদের মাঝখানে কাঁটার দেয়াল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল চলতি ধর্ম।

গোলগাল একটা মিষ্টিকুমড়ার মতো তাদের বিদ্রোহী হৃদয়

কেটে ফালি ফালি করেছিল অবিবেচক অর্থনীতি—

তাদের পিছনে হায়েনা সেজে পাহারা দিয়েছিল জন্মান্ধ সময়ের রীতি।

চারপাশের সবকিছু টুথপেস্ট, ব্রাশ, ঘড়ি, চিরুনি, খাতা, রঙের পোঁচ

হয়ে যাচ্ছিল একে একে ধাতব কাঁটাচামচ।

কাঁটাচামচ... কাঁটাচামচ... কাঁটাচামচ... কাঁটাচামচ... কাঁটাচামচ

আমাদেরকে গেঁথে ফেলছে খোসাছাড়া দুই টুকরা পাকা আমের চাকতির মতন।

সেই থেকে শুরু আমাদের আমৃত্যু বন্দি আকাশের নক্ষত্র পতন...

নিজেকে আরো বেশি করে চেনা জানা

বুনো বাতাসে উরাধুরা মেঘগুলো ঘুরপাক খেতে খেতে

যেন বুড়া দাদু ভিঞ্চির মাথায় আলোর চক্র পরা পাহাড়ের দেবীর মতন

আমার চারপাশে উড়ে উড়ে কোনোদিনও না চেনা পাখি হয়ে চলে যায়

তোমার শহরের চূড়ায় কিছুক্ষণ কাঁদার অভিপ্রায়ে।

আর আমি মরুভূমির বৃক্ষের মতো ধৈর্য ধরে থাকি

জল ছাড়া আরো কত আয়ুষ্কাল বেঁচে থাকা যায়।

বৃষ্টির ফোঁটায় নুয়ে পড়া মাটির আঁতুড়ঘরে জন্ম নেয় অন্ধকারের সূর্যশিখা—

তার নীলাকাশ পরিবারে নতুন প্রথার চিরাচরিত পুনরাভিনয়।

ঈশ্বরের ডায়েরিতে লেখা আমি নামক কেউ

পৃথিবীতে আমার সাথে তার দেখা হয়ে যায়।

নিজের মুখের আদলের অসীম কারখানায় যে বর্ণান্ধ ভাস্কর

আমৃত্যু মুখোশে মুখোশে রং লেপে যায়

আমি তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আলিঙ্গন করতে গিয়ে

হারিয়ে যাই তার বহরূপী অস্তিত্বের সীমায়।

নিজেকে হারানোর ভয়ে মেশিনজাত মানুষগুলো ছাঁচের মালিকানা নিয়ে

যুদ্ধ করতে করতে নিজেই শেষে কানা হয়ে প্রতারণা করে প্রেমের সাথে।

প্রেমকে হারানোর ভয়ে সামাজিক মানুষগুলো মেশিনের মলিকানা নিয়ে

মামলা করতে করতে রোবট হয়ে ঠকায় নিজের মধ্যে আগত প্রেমিকটাকে।

আঁতুড়ঘরে জন্ম নেয়া ফুলের পিছে জীবন এক জলজ্যান্ত আঁতুড়ঘর হয়ে

জন্ম আর মৃত্যুর ক্যালেন্ডারে পাওয়া কঞ্জুস হিসাবকে

মুছে দেয় রক্তের ঢেউ বিছিয়ে।

সমুদ্র রঙের এক পরি বিকেলের বালুকাবেলাকে

অক্টোপাসের মতন টেনে নেয় নিষিদ্ধ অতলে।

জেগে ওঠা চরে মৃত ইঁদুরের ছানার গোলাপি মাংস ছিঁড়েখুঁড়ে খায় বুভুক্ষু ঈগল—

আমি তার পাশে বাতাস হয়ে দোলা দিয়ে যাই একাকিত্ব দিয়ে বাঁধা নৌকার পাল।

শুধু আঁতুড়ঘরের কান্না দেখে ফিরে যাব না বলে চলে আসি

লাশ কাটা ঘরে আবাদ করতে কিছু স্মিত হাসি।

শুধু প্রেম নিয়ে তৃপ্ত নই বলে ঘৃণার ছায়ায় দিই শাশ্বতের ফাঁসি।

তোমরা আমাকে চিনে ফেলার আগেই আমার চারপাশ থেকে লক্ষ লক্ষ

আমি এসে মাটির স্তরের মতো ঢেকে ফেলে দেয় আমাকেই কবর—

তোমাদের বিভ্রান্ত করার কোনো অভিসন্ধিতে নয়;

মহাশূন্যের এক এক কণা মার্বেল রঙিন শূন্যতা জড়ো করে

নিজেকে আরো বেশি করে চেনা জানার সংশয়—

সূর্যের চোখের আলোতে অন্ধ না হয়ে নিজের অন্ধতায় সূর্যবীজ বোনার আশায়।

অফলাইন

ইলেকট্রিক তারের মধ্যে দিয়ে গড়াতে গড়াতে

তোমার নোটিফিকেশনে আমার উপস্থিতি

নিঃশব্দে জানিয়ে দেয়: বেঁচে আছি!

মরে যাওয়ার পর কাউকে পাঠানো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টের মতো

কিছু পাতা, ঢেউ আর জোনাকির হাতছানির রিকোয়েস্ট

জমা হয়ে আছে বহুদিন ধরে অ্যাড কিংবা ইগনোর করার বক্সে।

সমুদ্র আর আকাশ হাত ধরে ঘোরে যে বিচের ছায়ায়

নিরুদ্দেশ কোনো নাবিকের চোখের তারার মতো সূর্য ডুব দেয়

নীল অরণ্যে পরিদের চোখ হয়ে জ্বলে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা—

প্রবালের বুড়ো পিঠে ঠোঁট দিয়ে চিঠি লেখে শঙ্খচিল

আর এই গুমোট শহরে চারকোনা ক্যালেন্ডারে

তোমার ব্যস্ততা আর ছুটির দিনের চিরাচরিত গরমিল...

অনলাইনে আমাকে খুঁজো না—স্মার্ট ফোন তোমাকে

যত সহজলভ্য করে দেয়, তত সহজলভ্য তুমি না।

তোমার কাছে হীরার খনির মতন দুর্লভ যে বন্যতা—

সে-ই আসলে হওয়ার কথা ছিল সহজলভ্য। চামড়া পুড়ে

ঘড়ির বেল্টের নিচে যে সাদা দাগ, সেখানে সানস্ক্রিন না মেখেই

ঝাঁপ দেয় অবিচল রোদের পাখা। অনেক দূরের ঝরনার ওপর থেকে

একটা ঝোপের নিঃশ্বাস চুরি করে ঢুকে যায় তোমার ঘরে।

একটা রঙিন পোকা উৎসাহে ওত পেতে বসে আছে

জংলি পাতার নিচে তোমাকে অবাক করে দেবে বলে।

সারাদিন বড়শি পেতে বসে আছ ভার্চুয়াল লেকের ধারে

যদি দুই-একটা গোল্ডফিশ পাওয়া যায় তোমার মতোই

নিঃসঙ্গ। শিকার আর শিকার মিলে যদি মিলেমিশে প্রেম হয়ে যায়

এ রড-সিমেন্টের গভীর বনে। ডিসকভারির রোমাঞ্চকর অভিযান

টিভি-তে দেখে দেখে তোমার কিন্তু বাকি থেকে যাচ্ছে নিজেকে

ডিসকভার করার মুহূর্ত। যেমন ঘুটঘুটে অমাবস্যার রাত

জানে না সে নিজেই পূর্ণিমার রূপসি আলোর উৎস।

মাটির ঘরে

এ শহর এতই পশ, টাইলসের ত্বকে ঢেকে ফেলেছে

সব মাটি। তাই আমি আর মাটির গন্ধ পাই না।

শুধু পাই বিভিন্ন ধরনের পারফিউমে মরা ফুলের সুবাস।

বহু দূর নির্জন দ্বীপ থেকে উঠে আসা এক কুষ্ঠ রোগী,

তার নিরাময়ের নাম ছিল প্রেম। সে এই শহরের

প্রতিটা ঔষধের দোকানে ভিক্ষা করছিল জরুরি প্রয়োজনে আর

বিনিময়ে দিতে চেয়েছিল বেলুনে বন্দি বাতাসের

মতন তার আয়ু। তাকেও ফিরে যেতে হয়েছিল

কফিনের নির্জন গুহায় প্রেমের দেখা না পেয়েই।

সমুদ্রের গর্ভের নাড়ি দিয়ে এক শিশু ভবঘুরে

আসতে গিয়ে আটকা পড়েছিল ঊষর খরার চরে। ফেরেশতারা

সবাই মিলে নাড়ি কেটে তাকে বাঁচাতে পারেনি

তুলে দিতে পারেনি প্রজাপতির রংধনু চরাচরে।

বাক্সের ভেতরে বাক্স চাপা পড়ে আছে

বাক্স জন্ম দিচ্ছে আরেক নতুন বাক্স

একই ঘরে কানামাছি খেলি তুমি আমি

শামুকের খোলসে ঢুকে যাই কারো সাড়া পেলে...

সামনে আর যেয়ো না অনিকেত!

সামনে শিকারির ভয়ে খাঁচায় কাঁপছে আকাশ—

পিছু ফিরে চলো চলে যাই সেই পথে

যেই পথ দিয়ে জন্মের দুয়ার ফেলে পালিয়ে গেছে শিয়াল।

সেই পথের জানালায় জলতরঙ্গ হয়ে বাজে

বৃষ্টির খেয়াল। আমরা সেই বৃষ্টির শিশির মেখে ঠোঁটে

শেষ চুম্বনে এঁকে দেবো বজ্রপাত।

আর কাদা জলে ভাসিয়ে দেবো আমাদের

নিঃসঙ্গতার মুহূর্ত বোঝাই পাল তোলা নৌকা।

তারপর প্যানকেকের মতো নরম মাটি ছেনে ছেনে

বানাব সেই ভবঘুরে শিশুটাকে, যে ইচ্ছে করলে

আসতে পারে আমাদের দেয়াল আর ছাদবিহীন মাটির ঘরে।

অন্ধকারে বসে থাকে কিছু শবসাধক

অন্ধকারে বসে থাকে কিছু শবসাধক—

মৌনতা তাদের প্রিয় পানীয়

সন্ধ্যার পর থেকে তারা সেই পানীয়ের লোভে

জড়ো হতে থাকে পাখির বিষ্ঠা ভরা পার্কের বেঞ্চে।

শার্টের বোতাম ফুঁড়ে সদ্যোজাত শিশুর মতো বের হয়

রুমালে জড়ানো এক বোতল দেশি মৌনতা—

এমন সন্ধ্যার কথা সারাদিন ভেবে ভেবে

বসের একঘেয়ে উৎকট মুখ দেখে আর সব অন্যায় আবদার মেনে

অবশেষে সূর্য অস্ত গেলে একে একে পিঁপড়ার মতো

সারি বেঁধে জড়ো হয় মৌনতা খাদকের দল।

অন্ধকারে বসে থাকে কিছু শবসাধক—

অফিসের জিম্মা থেকে রাতে বাড়িওয়ালার জিম্মায়

যাওয়ার আগ পর্যন্ত নির্ধারিত তাদের জীবৎকাল।

আর মাঝে মাঝে এই আয়ু বাড়তে বাড়তে

চলে যায় পর্যটন বাসে চেপে সমুদ্র সৈকত কিংবা বান্দরবন।

বাকি সময় তারা চলমান শব হয়ে করে যায়

পৃথিবীটা নিরীক্ষণ। ঠোঁটের এক কোণে লেগে থাকে

কিছু দীর্ঘশ্বাস আর অন্য কোণে ছিটেফোঁটা উৎসব।

অন্ধকারে বসে থাকে কিছু শবসাধক—

আলোতে তাদের অ্যালার্জি, ছায়াতেও পরে নেয় ডার্ক সানগ্লাস।

জীবনকে চির পিপাসার্ত মরুভূমি করে রেখে

তারা নাকি শিল্পে ফলাবে উচ্চফলনশীল ঘাস।

না খাওয়া পেটে ভরপুর তামাক জোটে—

বহুদিন গোসল না করা চুলে ক্ষুব্ধতার ফুল ফোটে।

অন্ধকারে বসে থাকে কিছু শবসাধক—

কোনোকিছুতে তারা অবাক হয় না, কেননা ইতোমধ্যেই

শহরের গ্রন্থাগারগুলো থেকে অনেক বই তারা

প্যানকেক বানিয়ে খেয়ে ফেলেছে। এখন তাহারা

বিগত জ্ঞানের ঢেঁকুর তোলা ঘুমন্ত অজগর সাপ।

জোড়া শালিক, জোড়া ঘুঘু অথবা কাঠবেড়ালিকে

প্রেম করতে দেখলেই শুধু ছোবল হানে।

কঙ্কালদেহ নিয়ে অন্ধকারে বসে থাকে অন্ধ শবসাধক।

প্রেমিকের হাতের কৃষ্ণচূড়া কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে—

কারণ আজন্ম রক্তশূন্যতার রোগীর চেয়েও সে

ভয়াবহভাবে ফ্যাকাশে হয়ে আছে প্রেমশূন্যতায়!

রাস্তার পাগলের গান

এই রাস্তা কবরের শূন্যতা হতে অনেক উঁচু আর

তোমাদের নাক উঁচা বিল্ডিংগুলার চাইতে বহু নিচু;

এখানে শুয়ে শরতের মেঘের জঙ্গল দেখি সরাসরি তাকিয়ে।

পায়ে পায়ে চকমকি পাথরের চিহ্ন রেখে যায় সময়—

আমি অসময়ের চিহ্ন লুকিয়ে রাখি উল্কা ঝরার ক্ষতস্থানে...

যখন তোমার ডানার নীল পালকে সূর্যাস্তের চেয়ে লাল

বেদনার ছত্রাকের আক্রমণ;

তোমার ডালে বসা ফিঙে পাখিটা রোস্ট হয়ে চলে যায়

বন ও পরিবেশমন্ত্রীর পাকস্থলির মরু গুহায়।

সেই মরা পাখিটার নতুন জন্ম নেয়া ভ্রূণের সুর

আমার কাঁধের উপরে বসে বলে:

জীবন এক রাক্ষুসে পিরানহার চাওয়া পাওয়ার বাজারে

নিলামে বিক্রি হওয়া সমুদ্র...

তোমাদের দিকে মাথা তুলে দেখি তোমাদের মাথা

নতজানু হয়ে আছে মেশিনের টুকিটাকি যান্ত্রিক গোলযোগে।

তোমাদের পাগলাটে ঈশ্বরের মাথায় ছাতা ধরে আছে

ডলার, ইউরো, টাকার গর্ভজাত অপ্সরী সুন্দরী—

তোমাদের যোগাযোগের ধারালো ছুরিতে কাটা

আমি সেই যোগাযোগহীন একাকিত্ব।

তবু তোমাদের নিঃসঙ্গতার চাইতে আমার একাকিত্ব

আরো অনেক বেশি মাত্রায় সহনীয়।

তোমরা তোমাদের উন্মাদ ঈশ্বরের চিকিৎসাশাস্ত্রের বই খুলে

কাউকে যখন পাগল বলো সাথে সাথে

নিজেদেরকেও ছুড়ে মারো সুস্থ থাকার অসুস্থ ভণিতায়—

পায়ে পায়ে চকমকি পাথরের চিহ্ন রেখে যায় সময়—

আমি অসময়ের চিহ্ন লুকিয়ে রাখি উল্কা ঝরার ক্ষতস্থানে...

আধুনিক চাকর

কিচ্ছু ভাল্লাগে না তোমার, তবু মাঝরাতে

জানালার কাছে আসা মৃত্যু রঙের সসার

ড্রাকুলার আছরের মতো ঝাঁটা মেরে বিদায় জানাচ্ছ

আর সকালের পরির ডানায় না চেনা ফুলের গন্ধ খুঁজছ।

কিচ্ছু ভাল্লাগে না তোমার, শুরু থেকে শেষ

আর শেষতক শুরু একই গানের অনুরোধের আসরে

গাইতে কি ভালো লাগে? তবু বিশেষ এক রংধনুর প্রেমে

তার রং বাঁচাতে বিসর্জন দিচ্ছ তোমার রক্তের অনাহুত শিশির।

কিচ্ছু ভাল্লাগে না তবু ছেড়েও যাচ্ছ না মরা সূর্যের দেশ।

কিচ্ছু ভাল্লাগে না শুনে যাচ্ছি আর গুণে যাচ্ছি

ঘামের মোড়কে কাঁচা লবণের স্বাদ। যে ছেলেটা

সময়ের জারজ পেটে ডুবুরি হয়ে আনতে গিয়েছিল কবিতার মেঘ

সে আমার সৎ বন্ধু ছিল। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ার আগে

সে চিৎকার করে বলেছিল : ব্যাঙের ডিমের মতো ঘন সমস্যা যেখানে

সেখানে পুনর্জন্ম হয় ঈশ্বর আর শয়তানের।

সেই অসহ্য ঈশ্বর আর শয়তানের প্রিয় ফুটবল খেলার মাঠে

আমজনতা দর্শক হয়ে জীবনের শিরায় শিরায়

ডেকে যাচ্ছি সামুদ্রিক সাইক্লোন। কিচ্ছু ভাল্লাগে না বলে

একটা কোনো অসীম ভালোবাসার বীজ এখানেই করেছি রোপণ।

নদীর মতো

খুলি তুলে ফেলা উন্মুক্ত মগজে

তুষার জমে আছে। তার মধ্যে

দূর থেকে কাছে এলে সবুজ খেলার মাঠ

আকাশে ঘুড়ি, পাখি, মেঘেদের হাট...

লক লক... স্মৃতিশক্তি সাদা

লক লক... বাড়াতে পারি না পা

লক লক... বাতাসে ওড়ে আগুনের কেশ

লক লক... আগলে রাখি ছদ্মবেশ

মরুভূমির ভূগোল ঘুরে এসে দেখি

নদীটা ঠিক সেখানেই শুয়ে আছে।

নদী... তাহলে এখনো বেঁচে আছে!

যখন অনেকবার মরে এবং বেঁচে

আমরা আবার পুনর্বাসনের কৌশলগুলো ভাবছি।

লক লক... স্মৃতিশক্তি সাদা

লক লক... বাড়াতে পারি না পা

নদীর কালো রক্তে জ্বলে একফোঁটা পিদিম

হয়তো সে কুমিরের পেটে যাওয়া জেলের আত্মা

অথবা কোনো খসে পড়া এলিয়েন দেবতা

ভালোবাসি ছোটো আলো, তার শান্ত প্রভা

লক লক... বাতাসে ওড়ে আগুনের কেশ

লক লক... আগলে রাখি ছদ্মবেশ

নদী বেঁচে আছে মানে আমরাও আছি বেঁচে

নদী চলছে মানে আমাদেরও বয়ে যেতে হবে

লক লক... স্মৃতিশক্তি সাদা

লক লক... বাড়াতে পারি না পা

লক লক... বাতাসে ওড়ে আগুনের কেশ

লক লক... আগলে রাখি ছদ্মবেশ

একাকিত্বের অমরতা

সভ্যতার শূন্য চোখগুলো পুড়ে গেছে ধূসর আগুনে

মৃত্যুর পরে জীবনযাপনের কর্মকাণ্ডে...

পাতাল সড়ক, পাতালের নদী, পাতালের আকাশ ছেয়ে আছে।

দুঃস্বপ্ন ভাঙে কাঁটাময় এক কুশ্রী কঙ্কালের খোঁচা খেয়ে...

কঙ্কালটাকে পোড়াব বলে চেনা-অচেনা জ্যোতিষ্কদের

হলকা যোগাড় করি, সে তখন পাথুরে বুড়ি।

তাকে ভাঙব বলে ধুলামুখ সমাধি থেকে

গ্রিক বীরদের ডেকে আনি, সে তখন লোহার খনি।

তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে সমুদ্রের কানে করি ফিসফাস,

সে তখন লালঠোঁটের প্লাস্টিকের হাঁস। ফালি ফালি করে কাটার

যখন অটল প্রতিজ্ঞা, তখনই সে হাওয়া। গুলি করতে যখন

তেড়ে গেছি, দেখি শয়তানটা মুদ্রিত চোখের ভিক্ষু মূর্তি...

জোনাকি নিয়ে

নিজেকে হত্যার সব কলাকৌশল

রপ্ত করে এখন

সামুদ্রিক প্রাণীর মতো যাচ্ছ

সন্ধ্যা দেখতে!

খুনির নির্মল আনন্দে চলেছ ভেসে।

বালুতে যেসব পায়ের ছাপ সমুদ্রমুখী,

পাশাপাশি ছাপে বোঝা যায়

তারা ফিরে গেছে ঘরে।

তারাও সমুদ্রের মতন।

জীবনে বারুদের আলোড়ন...

সূর্য তার সারাদিনের শ্রমের গল্প শোনায়

আকাশ ভরা প্রজাপতি তারাদেরকে।

যে পথে পালিয়ে যাও অগোচরে

সে পথের হাত ধরে

ফিরে আসো বৃষ্টিহীন বিবর্ণ শহরে।

পথে আসতে আসতে দেখো

কৃষক তার প্রেয়সী খেতের সাথে

সবুজ সঙ্গমে হয়েছে ঘামের ঝরনা।

সেই ঝরনাই উর্বর করে তাদের বীজগুলোকে।

এতদিন ভালোবেসে যাকে হত্যা করো

অনায়াসে তাকে বাঁচাতেও পারো।

নিকষ অন্ধকারে বন থেকে তুমিও ফেরো

মন ভরা জোনাকি নিয়ে।

বোবা রাতে

আমি আমার বোবা দুঃখের চিরকুট

ভাঁজ করে একটা প্লেন বানিয়ে

ছুড়ে দিলাম তোমার দিকে।

তুমি খুলেও দেখলে না। একটু পরে

আমার আশেপাশে টুপটাপ করে

ঝরে পড়ল কয়েকটা চিরকুট প্লেন।

আমিও সেগুলো না পড়ে পাশ কাটিয়ে

চলে গেলাম 'উত্তরাধুনিক একাকিত্ব' নামক

মরুভূমির দিকে।

কী ভয় মনোব্যথায়?

পিপীলিকার মতো মন,

তার ধারণক্ষমতার চাইতে বহুগুণ

ব্যথা ধারণে অভ্যস্ত।

ব্যথা, এক পুরোনো অসুখের নৃত্য।

শোনো কান্নাফুল! কানে কানে বলি

আমিও ক্রন্দনপ্রয়াসী...

এই রাতের চোরা কক্ষ নদী ভাঙনের মতো

যাদেরকে নিঃশব্দে তুলে নেয়

কে হতে চায় তাদের দলভুক্ত?

তাদের নাম লেখা হয়

কোনো রাষ্ট্রের কপালে ভস্মের কালি দিয়ে।

তোমার সঙ্গে সমুদ্রযাত্রার মোহটা ঝলমল করবে

গাংচিলের লবণাক্ত অধরে।

এক ঝাঁক ফেরারি পাখি ডুবসাঁতারে

বয়ে আনল সমুদ্রতলের নিমজ্জিত চাঁদ।

ছাদ ফুঁড়ে সেই সাহসী চাঁদ এখন মাথার ওপরে।

পাগলা গারদে, হাসপাতালে, টর্চার সেলে, রিহ্যাব সেন্টারে,

শান্ত শিষ্ট ঘরে

অনেকে মরছে, অনেকে ঘুমাচ্ছে।

মহাকাশের নীল জন্মান্ধ জরায়ু

নীরব বেদনায় জন্ম দিয়ে যাচ্ছে কেবলি

দুঃখের খেত ভরা গ্যালাক্সি, ছায়াপথ, উল্কা

নক্ষত্রপুঞ্জের সবজি।

হে সারমেয়, হে ডগি, হে ভোগী!

পৃথিবীর সবুজ সমুদ্রের ওপার হয়ে আছে চুপ

বনের পেছনে মেঘ, মেঘের পেছনে শৈল...

কুয়াশায় যে বৃষ্টিকণা ঝরে মৃদু ঢেউয়ের ঝংকারে

তার ছোঁয়ায় শৈবাল গজায় স্থবির শরীরে

এলোমেলো এলোমেলো...

সময় বয়ে যায়, থামাতে পারি না

আমি থেমে আছি, চলাতে পারি না

রাত্রির গুহায় চোখ থমকায়

কাক বসে আছে কালো জানালায়

চাঁদের বালিশ থেকে তুলা খসে যায়

এই তুমি নও তুমি

এক রঙিন তারা সাঁতরে এসে

মেশে তোমার অতৃপ্ত অস্থিরতায়

সময় বয়ে যায়, থামাতে পারি না

আমি থেমে আছি, চলাতে পারি না

আজব শূন্যযানে ভাসি যে সদাই...

যাহা চলে কিন্তু ব্রেক নাই

সময় বয়ে যায়, থামাতে পারি না

আমি থেমে আছি, চলাতে পারি না

যে প্রাণীগুলো ঘোরে চতুর্দিকে

খরগোশের মতো, নেকড়ের মতো, কচ্ছপের মতো

তাদের সবার পিঠে কুঁজ লাগানো

সেই কুঁজের মধ্যে একটা করে ডাস ক্যাপিটাল

আর অনেকগুলো স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার আলো

তাহলে কী হলো?

সময় বয়ে যায়, থামাতে পারি না

আমি থেমে আছি, চলাতে পারি না

প্রাগৈতিহাসিক কুত্তা ঠ্যাং তুলে বসে আছে

সেক্রেটারিয়েট টেবিলে

আমি প্রলেতারিয়েত, সেই টেবিলের তলে।

মাথার কাছে বর্বর দেশগুলোর মৌচাক জড়ো করে

সেই কুত্তা ফোঁটায় ফোঁটায় অমৃত পান করে।

হে সারমেয়, হে ডগি, হে ভোগী!

আমার জন্য নির্বাণ, তোমার জন্য চার্বাক

বলো সত্য কী?

বলো সত্য কী?

রিভার্স

সমুদ্রের নিচে যে পাহাড় ফাটছে

তার ধোঁয়া এসে চোখে লাগে।

তার কম্পন আর গর্জন আছড়ে পড়ে অস্তিত্বে।

না, এইভাবে আর না!

জীবজগতের চেয়ে জড়জগৎ উজ্জ্বল মনে হয়

মনে হয় লুকিয়ে আছি কোনো ট্রেঞ্চে;

সকাল হবার অব্যক্ত অতৃপ্ত ভয়!

মমতার মেঘ কোথাও খুঁজে পাই না,

ধর্মঘটে কারখানা বন্ধ করে তারা চলে গেছে।

মাছের শরীরে ছাই মাখতে মাখতে মা ভাবে :

রূপকথার রুপালি মাছ কোন নদীতে থাকে?

কোন জলে নকশিকাঁথা বোনে তাঁতির মেয়ে?

কোন কুঁড়েঘরে অনাহারে ঘুমায় রাখাল ছেলে?

হৃৎপিণ্ডের চারপাশে কেউ নাই,

বিশাল হৃৎপিণ্ড খোলা পড়ে আছে চন্দ্রপৃষ্ঠে...

আমি সেইসব ডুবুরিকে কষ্ট করে শ্বাস নিতে দেখি

যারা নিজের অক্সিজেন নিজে উৎপাদন করে।

পরিবহন, বিপণনও করে সাম্যবাদী পদ্ধতিতে।

অতি প্রজননশীল ক্যাপিটালে তারা নতমুখ অচলানি।

ফেরাও অপরিকল্পিত পৃথিবী...

গ্যাংস্টার গ্যাংগ্রিন যখন রিভলবার হাতে

প্রেতাত্মার মতো পেছনে দাঁড়িয়ে আছে

ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে ডানদিকে দেখলাম পঙ্কিল গণতন্ত্র,

বামদিকে দেখতে পেলাম জমাটবদ্ধ সমাজতন্ত্র।

মারা যাবার আগে এটুকুই শুধু সে বলতে পারল :

পৃথিবীর সব শল্যবিদ মিথ্যা কথা বলে!

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা বলে!

দিনকাল

নিঃসঙ্গতা থেকে তোমার

প্রেম আর মহত্ত্বের শহরে এসে

আমি তো এয়ারটাইট টিনে

শুকনো মাছের মতো পচে যাচ্ছি!

কী করবা কিছু ভাবছ?

মরুভূমির বিশুষ্ক বুকে খাড়া পর্বতের মতো

দাঁড়িয়ে আছে ক্রেতাদের ঐক্য।

নিচে সবুজ আভায় গা ভাসায়

পোকামাকড়ের সবুজ ঘিনঘিনে রক্ত।

কোথাও কোনো মুক্তির চোরাকুঠুরি

বা গোপন মন্ত্র কি আছে?

কারাগারের শেকল শোনায় মন্ত্রণা।

চারিদিকে থইথই ভরাডুব আয়না

আমি তবু আকাশেও ডুবি না।

তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না

তোমার টাওয়ারে আমি কিছুতে পৌঁছাতে পারি না

তোমার সঙ্গে নাচে তাল মিলছে না

তোমার ঝড় আমার বৃষ্টিতে হয় না মূর্ত।

জানি তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি ধূর্ত।

নিঃসঙ্গতা থেকে তোমার

প্রেম আর মহত্ত্বের শহরে এসে

আমি তো এয়ারটাইট টিনে

শুকনো মাছের মতো পচে যাচ্ছি!

জানালার বাইরে তুমুল বৃষ্টি!

মেঘ থেকে জল এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে না তো,

পেঁজা পেঁজা মাংস শুধু ঝরছে তুষারের মতো

আলগোছে। আর চাঁদ দূর থেকে তির ছুড়ে

প্রতিটা মাংসখণ্ডে একটা করে চোখ দিচ্ছে এঁকে।

আমি যা ভাবি, যা কিছু করি, সংবেদনশীল মাংসরা

তা টের পেয়ে দেয় সাড়া।

ওরা আমার সেই মানুষখেকো গাছের পেটে

হজম হয়ে যাওয়া বন্ধুরা।

নিঃসঙ্গতা থেকে তোমার

প্রেম আর মহত্ত্বের শহরে এসে

আমি তো এয়ারটাইট টিনে

শুকনো মাছের মতো পচে যাচ্ছি!

আমি মনে হয় হারিয়ে গেছি।

ঝিনুকের মৃত্যু

তোমার চোখের ব্ল্যাক হোলে পড়ে থাকা টেলিভিশনে

আমার মৃত্যুদৃশ্য দেখে চলে যাই।

ফিরে আসি সেই টেলিভিশনটাকে মাকড়সার মতো মাঝখানে

বসিয়ে রেখেছে যে তন্তুগুলো, তা গোটাতে গোটাতে।

পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার আগে নদী

মেঘলা মেঘলা মাটির চরে স্বপ্ন ভেঙে জাগে

মনোলীন বনানী। শেষ না হতে

এমন করে শুরু হয় আগামী...

এইসব নাগরিক নিষ্প্রাণ বিস্মৃতি

আর তার সহজ সরল বিবৃতি

একটা করে কালো পতাকা গেঁথে রাখে

সোনালি কফিন বোঝাই মরুভূমির ফাঁকে ফাঁকে।

নির্লিপ্ত নীল আকাশ বেয়ে

আগুন লাগা সূর্যাস্তের দিকে

হামাগুড়ি দিয়ে চলে অপরিণত বৃষ্টির সারি।

তবু এ মৃত্যু আপেক্ষিক;

স্বার্থের গরাদে হয়তো বা যৌক্তিক।

আমি তোমাকে চিনি নাই,

আমাকেও তুমি দেখো নাই।

সময় থেমে তো থাকেনি...

হলুদ পাতা সবুজ হয়নি ফের

বসন্তের প্রতিশ্রুতিতে।

ঝিনুক মরেছে

খোলসের আবরণে।

আপন প্রেমিক

ডানায় উড়ে উড়ে বালুঝড়

তুমি ভরে দাও নির্জন মরুভূমির ছাদে

ফুটে থাকা ফুলেল গহ্বর।

আর আমি মোমের শরীরে

ফোটাই মাংসল ক্ষত বারবার।

অলংকারের আগুনে পোড়াই

এক নিঃসঙ্গ হরিণের গেরুয়া রং।

উপশম ভেবে বাড়াই হাত

ঔষধের মিষ্টি ঝাঁঝালো কারখানায়।

কিন্তু সে ঔষধের নির্যাসে মিশে রয়

শত অসুখের সুখি চলাচল।

কালো কালি ঢালা বিষাক্ত সমুদ্রের শিয়রে

ফানুসের মতো ঘুরে বেড়ায় রংধনুর দল।

নিহত মরীচিকা মিলনের প্রয়োজনে

ছুটে যায় খসে যাওয়া তারাকে লক্ষ্য করে।

কাঁটা বিছানো পথে হেঁটে প্রতিদিন

মানবিক তৃষ্ণায় খুঁজে বেড়াই সেই উদ্ভিদ

যার সাথে বাকি রয়ে গেছে

বাস্তবের রূপকথায় পাওয়া গল্প বলে যাওয়া।

ব্যক্তিক বাধাগুলো ঝরনা হয়ে নামে

প্রেমের শুষ্ক অচেনা সরোবরে।

অন্ধকারে অন্ধ চোখে দেখতে পাই

অন্ধত্বের এই সুর সার্বজনীন।

জন্মান্ধ মাছিরা শুঁড়ে রং মেখে মহাকাশের ক্যানভাসে

এঁকে যায় একই গড়পড়তা পেইন্টিং।

যে ব্যথায় বিমোহিত তুমি, তা তো চিনেছি আমি

অনেক আগেই। এ চোরাবালি পুষে রাখি

জীবনের গভীর অ্যাকোয়ারিয়ামে। অপর হয়ে

নিজেকে ভালোবাসা শেখাই। যেমন

বহুকাল ধরে সূর্য নিজের আপন প্রেমিক।

যে সময় অপেক্ষা করে

শীত আসার অনেক আগেই থামাতে হলো এসি

আর নামাতে হলো শীতের কাপড়চোপড়।

ধুর, মেন্টাল শীতে যাচ্ছেতাই অবস্থা!

সন্ধ্যার জন্মান্ধ বেহালাবাদক, তুই দ্যাখ

ছোটো ছোটো কালো বাক্সের ভেতর জ্বলে ওঠেনি শুকতারা।

গজায়নি অর্কিড বা মানিপ্লান্ট।

হাত দুইটা শুধু ডানা হতে চেয়ে গলায় নিয়েছে ফাঁস...

কেননা, বেঁচে থাকা এখন এক ভয়াবহ সস্তা লাশ।

ফেসবুকের নীলচে ওয়ালে ভেসে ওঠা

লাল কচুরিপানার মতো নোটিফিকেশন

জানায়, এখনও কেউ কোথাও আছে,

কেউ কিছু করছে শ্মশানের ভেতর একটা

ল্যাপটপের সামনে ঝুঁকে। যেখানে মনিটরের আলো ছাড়া

অন্য কোনো বিকল্প আলো নেই।

জোনাকি পুড়ে ছাই তুষার আগুনে।

অপরিচিত বন্ধু অ্যাড হয় প্রতিদিনই, বাড়িয়ে চলে

ফ্রেন্ডলিস্টের এভারেস্ট উচ্চতা, যাদের সাথে কখনো দেখা হবে না

হবে না ঘনিষ্ঠতা কিংবা ঘোর শত্রুতা।

আর পরিচিত বন্ধুর সাথে পার্কে দেখা হয়ে গেলে

না চিনে চলে যাই; সন্তর্পণে ঝামেলা এড়াই।

পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ মেরে ফেলছে যুদ্ধাস্ত্রগুলো

বাকি অর্ধেক মারা যাচ্ছে নিরস্ত্র নীরবতায়...

মরুভূমিতে সূর্যের সাথে কানামাছি খেলে ছায়া,

বালুঝড়ে নিঃসঙ্গ মরীচিকা

তারাহীন আকাশে তড়পায়।

আগ্নেয়গিরির পিঠে হেলান দিয়ে বসে আছি

মুখোমুখি আমরা

পরস্পর উত্তাপের আশায়।

পাশে জংলি আবেগে বয়ে যায় দুর্ধর্ষ বেগুনি ঝরনা

অসহ্য নীরবতায়,

যে নীরবতা ক্রসফায়ারের চেয়ে বেশি মুখর।

দুর্গতি নাশ করে তুমিও লাশ হও, আমাদের সবার অপমৃত্যু নিয়ে গাঁথো সকালের জারজ জন্ম

এই হিম কুয়াশার জড়সড়ো চাদরের ভেতর এক অচেনা আগন্তুক নারী

স্টেডিয়ামের গোলাকার মঞ্চে শুয়ে প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে

লক্ষ লক্ষ লোক সারিবদ্ধ সিটে বসে অন্ধ চোখে দেখছে

সেই নারীর উদোম প্রসব।

প্রসব বেদনার আর্তনাদের সুর শঙ্খের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে

বধির করে দিলো তাদের নিজস্ব সংগীত।

লোহার চেয়েও তপ্ত লাল এক সূর্য প্রসব করল সে, তার জংলি

ধমনি ছিঁড়ে সবুজ রক্ত দর্শকদের পায়ের কাছে গড়িয়ে আসতেই

সবাই সিট ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করল, যেন এ রক্তের স্পর্শে

তারা জীবন্ত অবস্থা থেকে অসাড় মৃত্যু কিংবা জড় জীবনের নিশ্চলতায়

স্থবির হয়ে যাবে। তারা ডায়েরিতে রংপেন্সিলে লিখে রাখত

জন্মদিনের তারিখ কিন্তু মৃত্যুর তারিখ লিখতে ভুলে গেলেও

আসলে তারা মারা গিয়েছিল জন্মের আগেই।

জন্মকে তারা ঘৃণা করত মৃত্যুকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে।

দুর্গতিনাশিনী, তোমার অনেক হাতের অনেক রকম অস্ত্রে

রূপকথার ইঁদুরের মতো কেটে দাও সিংহের জাল, কী সব ভয়াবহ

কুয়াশার স্ট্রিং! দিনগুলো আর উজ্জ্বল নেই, রাতগুলো অন্ধকার লাগে না।

প্রেমগুলো বিরহের মতো, বিরহ প্রেমের সাথে একাকার।

শালিক পাখিরা বালুতে গর্ত খুঁড়ছে খনিজ আগুনের আশায়,

বালুগুলো শালিক পাখির পালকে খুঁজছে জীবনের শীতল বাতাস।

পৃথিবী সিলিং ফ্যানের মতো ঘুরছে মাথার ওপর,

আমরা স্থবির ঝুলে আছি পৃথিবীর ডানায়।

কোনোকিছুই কোনোকিছুর মতো নেই অনুভূতির কুয়াশায়।

কোনোকিছুই কোনোকিছু হচ্ছে না কুয়াশার অনুভূতিতে।

দুর্গতি নাশ করে তুমিও লাশ হও

আমাদের সবার অপমৃত্যু নিয়ে গাঁথো সকালের জারজ জন্ম।

দুর্গতিনাশিনী, তোমার অনেক হাতের অনেক রকম অস্ত্রে

রূপকথার ইঁদুরের মতো কেটে দাও সিংহের জাল, কী সব ভয়াবহ

কুয়াশার স্ট্রিং! আলাদা করো, দূরে সরিয়ে নিয়ে বিচ্ছিন্ন করো, যাতে

যে যার অস্তিত্বের আয়নায় চিনে নিতে পারে কী সে করছে আর কী তার

করতে বাকি আর কী সে করেছিল।

একমাত্র এইরকমের আলাদা আর বিচ্ছিন্ন হওয়াতে

আমরা আর হবো না আলাদা কিংবা বিচ্ছিন্ন।

একটি গাঁজা গাছের মৃত্যুগাঁথা

কৃষকের হাতের উর্বর কোদালে

ফলে মৃত্যুর সোনালি ফসল

কারখানায় শ্রমিক বানায় মৃত্যু বড়ি

তাই মৃত্যু দিয়ে রাতটাকে শুরু করি

একটু একটু করে যত বড়ো হই

শিকড়ে অন্ধকার মাখানো মাটি

আকাশ ভরে থাকে...

পৃথিবীর সব ফুল মহাবিপদ জেনে

কুঁড়ি হয়ে মিলে যায় কুমারী গাছে...

পাতা ঝরে হলুদ একটা পাখির পালকে

উড়ে যায় প্রখর শীতে

সবুজ পাতা ছাড়ার হয়নি এখনো সাহস

যদি বলো বের হতে পারি বৃষ্টির আহ্বানে...

বিপ্লবী ছিলাম তাই

বহু পথ ঘুরে এসে সোজা পথে পা মেলাই

তবু এ সুযোগ দুর্ভাগ্যের নিয়তি মেনে

জ্বলে ওঠে আজরাইলের ডানায়

বিচ্ছিন্নতার প্রহর গুনে ফিরে আসে

অর্ধেক বিকেল। পিঁপড়ার খাদ্য হয়ে নিঃশেষে

হচ্ছি শুধু শেষ, শুধু শেষ...

চাইলে আগলাতে পারি স্বপ্নের মহাদেশ।